সৈয়দ মুজতবা আলী
রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের পরম দুঃখের বিষয়, সে আলাপ-আলোচনার বাস্তব পরিণতি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে-বিদেশে', কিন্তু তাঁহার অনেক রম্যরচনা 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থেরও পূর্বে লিখিত—সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ রচনাসৃষ্টির বিষয়বৈচিত্র্য এমনই বিপুল ও বিভিন্নধর্মী যে গল্প-উপন্যাস রচয়িতা কথাসাহিত্যিকদের রচনার মত তাহার শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য। যেহেতু রম্যরচনাই তাঁহার লেখনীর প্রথম সৃষ্টি, এই কারণে রচনাবলীর প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে প্রধানত রম্যরচনার গ্রন্থগুলিই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে ডক্টর আলীর আত্মীয়-স্বজন অগণিত বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে যে উপদেশ-পরামর্শাদি পাইয়াছি, তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডক্টর আলীর মধ্যম-অগ্রজ সুপণ্ডিত সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁহার লিখিত ডক্টর আলীর জীবনীটি এই রচনাবলীতে সংযোজিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাদের ঋণবদ্ধ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

শবনম্‌মধুর

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ শহর সিলেট জেলার ভিতরে ছিল। বর্তমানে করিমগঞ্জ আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী (পরে খানবাহাদুর) তখন সেখানে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। আমাদের আম্মার নাম আমতুল মন্নান খাতুন।

মুজতবা আলীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা থেকে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স যখন পাঁচ তখন মিঃ জে. হেজলেট আই. সি. এস. (ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন) আসেন চাড়াভাঙ্গায় বাবার অফিস পরিদর্শন করতে। সেই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজ সাহেবের আগমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অফিসের বারান্দা লোকে লোকারণ্য। সাহেব নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাম হাতে বাঁধা মূল্যবান হাতঘড়ি। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজতবা আলী সাহেবের কবজিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে হাত রাখল। হেজলেট সাহের ছিলেন অমায়িক ব্যক্তি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন ছেলেটি কে? বাবা কাছেই ছিলেন। পুত্রের আচরণে লজ্জিত হলেন। সাহেব হেসে বললেন, 'নেভার মাইণ্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস!' এই ঘটনাটি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখনই সে ছিল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক। তখন সবেমাত্র কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মুজতবা আলীর ঝোঁক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ উইণ্ডফিল্ডের অনুবাদ সত্যেন দত্ত ও কান্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা আসে। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে ফুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব (I. A. Dawson) চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। ছেলেরা আরম্ভ করল ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন।

তখন যেসব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। আমার বাবা তখন ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার। (আসামে তখন এ চাকুরির নাম ছিল—স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার।) ডেপুটি কমিশনার বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেন। মুজতবা আলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার মনোভাব অনমনীয়। সে কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হল না। আমার বাবার মনে হল তাকে সিলেটের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরাতে পারলে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখে। চিঠিতে জিজ্ঞাসা ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?' রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। কবির সিলেট ত্যাগের সপ্তাহখানের পরে আশমানী রঙের খামে ও আশমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবা আলীর নামে আগরতলা থেকে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। ১০।১২ লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকেই কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ মুজতবা আলীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাবা তাকে সরকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে সে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকার করে। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। মুজতবা আলী বোধ হয় বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে প্রথম বাইরের ছাত্র। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলি ও কীট্সের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সে বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়। মুজতবা আলী ও গুজরাটের বাচ্চুভাই শুক্লাই বোধ হয় বিশ্বভারতীর প্রথম বছরের গ্রাজুয়েট।

বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ছিল ধারালো। শেষ জীবনের মাথাজোড়া টাক থেকে তার যৌবনকালের চেহারার হদিস পাওয়া কঠিন ছিল। বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র। সিতারা শব্দ পরে সিতু রূপে সংক্ষিপ্ত হয়। তাই মুজতবা আলী মার্জার-নিধন কাব্যে লিখেছে—

"বাণীরে বন্দিয়া কেচ্ছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুন পুণ্যবান।"



শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলিগড়ে পড়াশুনা করে। সেখানকার পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যদিও সে সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

এই সময়ে তার কাবুল যাওয়ার সুযোগ হয়। আমানুল্লাহ্ খান তখন আফগানিস্থানে ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া ও রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানভ্ তখন কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সে কাবুল শিক্ষা-বিভাগে চাকরি পায়। তার দায়িত্ব ছিল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ে অধ্যাপনা। কাবুলে প্রায় দুই বছর থেকে সে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি দেশে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হয়েছেন। পড়াশুনার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে ফিরতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার আব্বা তৎকালীন ভারতীয় লোকসভার সহ-সভাপতি। সিলেটের সুসন্তান আবদুল মতীন চোধুরীর সাহায্যে মুজতবা আলী দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে। মুজতবা আলীর কাবুল-প্রবাসজীবনের সরস বর্ণনা আছে 'দেশে-বিদেশে' বইতে। কাবুল থেকে ফিরে এলে মুজতবা আলী বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। এই সময় বিশ্বভারতীর ডিগ্রী বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করে নি। শুধু ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতী ও জামিয়ামিলিয়া ইত্যাদি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত। মুজতবা আলী Wilhelm Humboldt নামক জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তি জার্মানীতে পড়াশুনা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমি তাকে মাসে একশ টাকা করে পাঠাতাম। মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বার্লিনের মত বড় শহরের হট্টগোল তার সহ্য হয় নি। কয়েক মাস পরে সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এখানে দুই বছর পড়াশুনা করে সে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'The orign of the khozhas and their religious life to-day'. জার্মানী থেকে শিক্ষা সমাপন করে সে ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসে।

এর পর সে পুনরায় ইউরোপ যায় ও ইউরোপ থেকে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। সে যখন কায়রোতে তখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার পরিদর্শনে যান।

এখানে মহারাজাকে মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং দেশে ফিরলে তাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সালে দেশে ফিরে মুজতবা আলী বরোদায় যায়। মহারাজা তাকে বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মুজতবা আলী প্রায় আট বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা করে। এই সময়ে সে গুজরাটের একখানি আরবী ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করে। এই কাজ সে শেষ করতে পারে নি। সয়াজীরাও মুজতবা আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতেন। মহারাজার মৃত্যুর

পর বরোদার পরিবেশ মুজতবা আলীর কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি। তখন সে বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এই সময় থেকে সে দীর্ঘকাল ৫ পার্ল রোড়ে তার বন্ধু আবু সৈয়দ আইয়ুবের সহচার্যে বাস করে। আইয়ুব যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী যান। মুজতবা আলী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে সে কিছুকাল বাঙ্গালোরে বাস করে। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই সে দেশে-বিদেশে লেখার কাজে হাত দেয়।

মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়। ১৩৪২ সালের মোহম্মদী পত্রিকায় তার মিশরের শিক্ষায়তন শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে মে মাসে সে সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। তার ভাষণ মাসিক মোহম্মদী ও সিলেটের আল-ইস্‌লাহ পত্রিকায় ছাপা হয়!

এর পর সে আনন্দবাজারে সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে একটি 'কলম' লিখতে আরম্ভ করে। মুজতবা 'রায়পিথোরা' এই ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজেও লিখেছেন।

১৯৪৮ সালে সে দেশ পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' লিখতে আরম্ভ করে। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নূতন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এর পরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তার রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তার মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সে অনেক আরবী ফরাসী শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার কলমের গুণে তার ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তার ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। লঘুচালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে সে এক অভিনব রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অতি সাধারণ ঘটনাকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ-শক্তি আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে তীব্রতর স্বচ্ছ রূপপ্রদানের ক্ষমতা তার অসাধারণ।

মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে। তার প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার লেখা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পুস্তিকা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। এই সকল কারণে সে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

পরে সে প্রায় সাত বৎসর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশনের ডিরেক্টার ছিল। এই সময়টা তার সুখে কাটে। এসময় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র

নবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পরে সে পাটনা ও দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকুরি করার আগে সে ভারত গবর্ণমেণ্টের Cultural Relation সংস্থার সেক্রেটারী ছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে সে জার্মান ভাষা অধ্যাপনা করতো। পরে সে বিশ্বভারতীর ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়।

মুজতবা আলী ছিল বহুভাষাবিদ। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষার তার দখল ছিল। সে পনেরোটি ভাষা জানতো।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল—দেশে-বিদেশে, চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য় পর্ব), ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, চতুরঙ্গ, শবনম্‌, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। দ্বন্দ্বমধুর, ভবঘুরে, টুনিমেম, দু'হারা, হাস্যমধুর, প্রেম, জলে-ডাঙায়, শবনম্‌, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। দ্বন্দ্বমধুর মুজতবা আলী ও রঞ্জনের উভয়ের রচনার সংকলন। এ সকল বই ছাড়া তার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা, পছন্দসই, বহুবিচিত্র ইত্যাদি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একখানা বই 'তুলনাহীনা' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সে পূর্বদেশ পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখে।

পূর্বে অ্যাসিস্টাণ্ট ডি. পি. আই. পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজে পড়ছে।

মুজতবা আলী ছিল আমার আব্বার কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্মের পরেই আমার আব্বার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আব্বা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। মুজতবা আলী বন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মুজতবার থিসিস সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। তাঁর ওফাত হয় ১৯৩৯ সালে ৭৪ বয়সে। ১৯৪৮ সালে মুজতবা আলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের আব্বা মুজতবা আলীর সাহিত্যখ্যাতি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী

দেশে-বিদেশে বইখানা প্রথম প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠকসমাজ চমকে উঠল, আর তারপরে বইয়ের পরে বই প্রকাশিত হয়ে সেই প্রথম চমককে অব্যাহত রাখলো, শেষ পর্যন্ত সেই চমকের ভাব অব্যাহত ছিল—যদিচ পাঠকের চোখ তখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। লেখকের এই ক্ষমতা বিস্ময়কর ও বিরল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম আজ দুই বঙ্গে সুপরিচিত, শ্রেষ্ঠ লেখক-গণের তিনি অন্যতম। আমার সৌভাগ্য এই যে পাঠক সমাজের কাছে লেখক রূপে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। আমার হাতের কাছে কয়েক খণ্ড শান্তিনিকেতন পত্রের পুরাতন ফাইল আছে, তার মধ্যে চোখে পড়লো ১৯২৬ সালে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই তালিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী নামটি। ঠিক কোন্ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মনে নেই, ১৯২১ বা ১৯২২ হওয়া সম্ভব। তাঁকে প্রথম দেখে Curram অঙ্কিত শেলীর ছবির মুখ মনে এসেছিল, সেই উজ্জ্বল উদাস চোখ, সেই এলোমেলো চুলের অজস্রতা, সেই মুখমণ্ডলের ছাঁদ। অপরে এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে গেলেন না, শান্তিনিকেতনেই কিছু কিছু বিদেশী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। কবে তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন এখন আর মনে নেই, আমি ১৯২৭ সালে পরিত্যাগ করেছিলাম, হয়তো তার কিছু পরেই। এবার তাঁর আরম্ভ হল বিদেশ ভ্রমণের পালা—জার্মানীর প্রতি বিশেষ টান ছিল তাঁর। তখন এবং তারপরে একাধিকবার জার্মানীতে গিয়েছেন, ইউরোপের অন্য দেশেও। জার্মান ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে গিয়েছিলেন। ভাষা শিক্ষাতেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ফরাসী ভাষা বেশ ভালো জানতেন।

এই সময়টার তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুদের মুখে শুনতে পেতাম তিনি কখনো কাবুলে, কাবুল কলেজের আহবানে কলেজের অধ্যাপক, কখনো শুনতে পেতাম বরোদা কলেজের অধ্যাপক। তারপরে একদিন শুনলাম দেশে ফিরেছেন, আপাতত বিদেশের পালা শেষ। দেখাও হ'ল। এবারে এসে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, কখনো পাটনায়, কখনো দিল্লীতে। কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসতে পারলেন না, তাঁর মধ্যে যে ভবঘুরেটা ছিল ঘুরিয়ে মারতো সে। তা ছাড়া চাকুরির ছক-কাটা জীবন তাঁর পছন্দ নয়। অবশেষে সমস্ত চাকুরি পরিত্যাগ করে মুক্ত-পুরুষ হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। তখন তাঁর আয়ের একমাত্র পথ কলম। কলম তাঁকে জীবনের শেষ পর্যন্ত খোরাক যুগিয়েছে।

আগে বলেছি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা শেষ হল। তবে শেষ হয়েও শেষ হল না, রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল দেশে-বিদেশে গ্রন্থরূপে। এখানাই তাঁর

শ্রেষ্ঠ বই, সেই সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকে ধরা যেতে পারে। তাঁর বহির্মুখী মনের পরিচয় দেশে-বিদেশে, আর বহুমুখী মনের পরিচয় পঞ্চতন্ত্রে। সমস্তর মূলে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল। তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে, এ যেন আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সে-সব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের পথে বিপথে এই চালে রচিত, সে যেন লেখকের হয়ে কলম কথা বলে চলেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুজতবা আলীর রচনার পার্থক্য এই যে তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসির অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা করেছেন পদ্যে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। এ আলালের ঘরের দুলালের ফারসি-বহুল বাংলা নয়—বাংলার সঙ্গে ফারসি মিশিয়ে এক নূতন ধাঁচ—অথচ কখনো অবাংলা বলে মনে হয় না। বৈঠকী রীতির এই বিশেষ স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান। দ্বিতীয় দান দেশ-বিদেশের আবহাওয়াকে বাঙালীর মনের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তৃতীয় দানের কথা বলতে হলে প্রথম দানের উল্লেখ করতে হয়, মনীষাকে বৈঠকী রীতিতে প্রকাশ। বিদ্যা আছে অথচ বিদ্যার ভার নেই—এ যেন চন্দ্রলোকের আবহাওয়ায় ভারের লঘুভবন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও পাণ্ডিতী করেন নি—সেই জন্যে সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণ তাঁর রচনার প্রতি। তাঁর অকাল মৃত্যু একটি সম্ভাবনাকে হঠাৎ ছিন্ন করে দিল, কেবলই মনে হতে থাকে না-জানি আরও কী ছিল তাঁর রহস্যময় ঝুলিটার মধ্যে !

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী বা আমাদের সৈয়দদার রচনাবলীর ভূমিকা আমি লিখতে বসেছি, এ সংবাদটি তিনি জীবিতকালে পেলে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন এবং সেই মজার ঘটনাটা নিয়েই পঞ্চতন্ত্রের একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন, আর রচনাটি যে খাসা হ'ত—সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।

ঘটনাটা হাস্যকর বটে, হয়ত সৈয়দদার পক্ষে শোচনীয়ও। কিন্তু কি করব বলুন, যদি আর কেউই লিখতে সাহস না করেন, একজনকে তো অগ্রজকৃত্য, বন্ধুকৃত্য করতেই হয়। আমার দিক থেকে একটা প্রশংসার দাবী এই করতে পারি যে, তাঁর মুখ চেয়ে হাস্যাস্পদ হবারও ভয় করি নি। দেবদূতরা যেখানে পা ফেলতেও ভয় পান, সেখানে আহাম্মুকরা অনায়াসে ছুটে আসে—এই অবশ্যবর্ষণীয় বিদ্রূপবাক্য ভাগ্যে আছে জেনেও, অথবা জেনেই, এ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।

তবে সাফাই একটা আছে। সেটা সৈয়দদাই দিয়ে গেছেন। তিনি নেতাজীকে উপলক্ষ ক'রে যা বলেছেন, তা আমরা তাঁর বেলায়ও কাজে লাগাতে পারি।

"আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয় —শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

"দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজীতে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার কাপ ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ ইজ স্মল, বাৎ আই ড্রিঙ্ক অফতেনার··· ।'

"আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর না-ই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে সে-ই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে।"
[পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ষোড়শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭]

সৈয়দ মুজতবা আলী নেতাজী নন—তেমনি আমিও মুজতবা আলী নই। সুতরাং অন্ধের হস্তীদর্শনের উপমাটা এখানে বেমালুম খাটে। আর ঐ

কথাটাও—'মাই কাপ ইজ স্মল—বাৎ আই ড্রিংক অফ্‌তেনার।' অনেকবার অনেক রকম ভাবে সৈয়দদার রচনা দেখতে বুঝতে, তা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি ; তাতে আমার সামর্থ্যের বাটি যতই ক্ষুদ্র হোক—সে রসের কিছুমাত্র স্বাদ পাই নি, এমন হ'তে পারে না। সুতরাং সৈয়দসাহিত্যচর্চা আমার পক্ষে একেবারে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা না-ও হতে পারে।

তবে, নির্বোধ হলেও, গেছো বোকা হয়ত নই (কে জানে, এই পংক্তিটি পড়ে পাঠক খুব একচোট হেসে নিচ্ছেন কিনা)। ঠিক ভূমিকা যাকে বলে তা আমি লিখতে বসি নি। মূল্যবান কোন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লেখা হয়, অন্তত যা রীতি—তাতে কিছুটা সমালোচনা থাকে, কিছুটা থাকে 'উজ্জ্বল অঙ্গুলি করে' গুণগুলো দেখিয়ে দেওয়া, 'অজ্ঞান তিমিরান্ধ্যস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া' চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এক কথায় কিছু ব্যাখ্যার কাজ করা।

সৈয়দ সাহিত্যে এটা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর রচনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, ঝরণার জলের মতো স্বচ্ছ—সেই রকমই সুস্বাদু, সুপেয়, স্বাস্থ্যকর। তাঁর রচনায় আবিলতা নেই, তা সোজাসুজি পাঠকদের হৃদয়ে পেঁছিয় এবং কিছুটা রসায়নের কাজ করে বলেই তিনি এত জনপ্রিয়। নইলে, তাঁর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পূর্ণ মূল্য দেওয়া, তার সমস্ত বক্তব্য বুঝে তার রসগ্রহণ করা অধিকাংশ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তুলনাটা আর একটু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে গেলে বলতে হয়—তাঁর রচনা অনেকটা পায়েসের মতো। খাঁটি দুধ, কামিনী বা গোলাপ-সরু চাল, নলেন-গুড় সহযোগে প্রস্তুত পরমান্ন, সুস্বাদু ও লোভনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক, সম্পূর্ণ জীর্ণ করা কঠিন। তবু, জীর্ণ না হ'লেও যেমন রসনামন অনির্বচনীয় ভাবে তৃপ্ত হয়—মুজতবা আলীর রচনা তেমনিই একটা তৃপ্তি দেয়, সবটা না বুঝে, রেফারেন্সগুলো না জেনেও অনেকটা আনন্দলাভে বাধা থাকে না। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিয়েও অনেক কিছু আছে তাঁর লেখাতে, আর তার আস্বাদে কোন বাধা নেই—কাঁটা-খোঁচা যাকে বলে—সেই জন্যেই আমাদের মতো গোলা লোকও পড়ে প্রচুর আনন্দ পান। ইলিশমাছ সৈয়দদার খুব প্রিয় ছিল—কিন্তু ভাগ্যে তাঁর রচনা অত কণ্টকা-কীর্ণ নয়, হিন্দুবিধবার নিরামিষ ব্যঞ্জনের মতো (এও সৈয়দদার প্রিয় অবশ্য) সুস্বাদু ও কিছু হয়ত গুরুপাক—তবু অনায়াসে অন্ধকারেও খেয়ে যাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সুবিধে। সবটা, কি দিয়ে কি তৈরী, না বুঝলেও মোটামুটি রসাস্বাদনে বাধা থাকে না।

না, ব্যাখ্যা করারও যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি সমালোচনা করারও না। আমি ওঁর সঙ্গে একমত, "সমালোচনা লেখার মতো শক্তি—দুষ্ট লোকে বলে শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই।......আর কী-ই বা হবে সমালোচনা লিখে? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে?... আলগোছে তফাৎ থেকে সমালোচনা-প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয়

অনেকেই—অর্থাৎ রোক্কা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জন্যে একটু-আধটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে চারের রস যত না পেল বঁড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে দুত্তোরছাই বলে তাসপাশাতে ফিরে যায়।"

ব্যাখ্যাও করব না সমালোচনাও করব না—তবে ভূমিকা নাম দিয়ে এ কী আবোলতাবোল লিখতে বসেছি?—স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। হক কথাও। আমি বলব—ঐ অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো, আমি যেটুকু তাঁকে দেখেছি বুঝেছি—সেইটুকুই এখানে বলব। সহৃদয় পাঠকদের পছন্দ না হয় পড়বেন না। দয়া ক'রে এই পাতা কটা উল্‌টে যাবেন।

সৈয়দসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রথমেই আমার যা মনে হয়েছে, আমার বিশ্বাস আরও অনেক সুধী পাঠকের হবে—মুজতবা আলী মূলত কবি ছিলেন। চিরজীবন বেশির ভাগ গদ্য রচনা করে গেলেও তাঁর মন ছিল কবির মন, দৃষ্টি ছিল কবির দৃষ্টি। তাই যেখানেই দেখেছেন কোন অবিচার অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, স্বৎ নিরপরাধ লোকের শাস্তিভোগ, সেখানেই তিনি অতি সেন্টিমেন্টাল কোমলহৃদয় ব্যক্তির মতো হাহাকার ক'রে উঠেছেন। সে হাহাকারে কখনও ভাগ্যের প্রতি, বিধাতার সম্বন্ধে নিরুপায় ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—কখনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকট উষ্মা। তাঁর 'শমীম', 'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সমুখে ঘন আঁধার' রচনা দুইটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হয়ত 'মৃত্যু'কেও এর মধ্যে ফেলা যায়। এমন কি যে আঘাত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ওপর আসে নি, যা তিনি নিজে দেখেন নি—তাও তাঁকে এক এক সময় কত বিচলিত করত তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মৃত্যু' রচনাটি। মৃত্যুর এই অকরুণ ও অকারণ আঘাতগুলো যদিচ প্রধানত তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ওপরই—লেখাটা পড়লে মনে হয় তাঁকেও কম বাজে নি।

তা ছাড়াও—তাঁর আপাতচটুল মজলিসী লেখার মধ্যে যেখানে যেখানেই তিনি প্রসঙ্গত কোন কাহিনী বলতে বসেছেন—সেখানেই দেখবেন করুণ কোন ঘটনা—করুণ বললেও ঠিক বলা হয় না—প্যাথেটিক* অভিজ্ঞতা। যেমন কোদণ্ড মুখহানার, শামসাদবানুলয়লার ইতিহাস। এই ধরনের ব্যথাতুর, ভাগ্যের-হাতে-মার খাওয়ার কাহিনী তাঁর অজস্র রচনায় মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো রয়েছে। 'পছন্দসই' বইয়ের লেখাগুলো তিনিই সাজিয়েছিলেন—তাঁর নিজের প্রিয় লেখার সঙ্কলন হিসাবে—তাতে দেখুন, প্রায় সব রচনাই আসলে এই ধরনের করুণ বা প্যাথেটিক কাহিনী। এগুলি সবই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত করা—হয়ত সামান্য একটু হেরফের অদলবদল আছে, কিন্তু সত্য ঘটনার এক সের দুধে পাঁচপো জল পড়ে নি। 'ক্রন্দসী' গল্পই ধরুন না কেন—বলে-কয়েই শুধু নামটা পাল্‌টেছেন নায়িকার। বাকী সবই সত্য। তাঁর গুরুদেবের ভাষাতেই বলতে হয়—"শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে!"

* অভিধানে অর্থ লেখা আছে 'হৃদয়স্পর্শক।'

অশান্তি শুধু নয়,—"অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ/কুটিল কুৎসিত ক্রূর, এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম/তুমি সত্য-বীর, তুমি সুকঠোর নির্মল নির্মম/করুণ কোমল।" রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দদারই গুরুদেব তাঁর আর এক প্রিয় কবি সত্যেন দত্তর সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাঁর নিজের বেলাতেও হুবহু তাই খাটে। সত্যবীর না হোক, লেখার সময় কিছুকাল সত্যপীর নামও নিয়েছিলেন সৈয়দদা। 'এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম'—এ দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় ভুরি ভুরি। অথবা বলা যায়, এ ছাড়া কিছু নেই।

মুজতবা আলীর রচনা পড়তে শুরু করলে প্রথম একটা আলতো ধারণা হ'ত—তিনি হাসাতে বসেছেন। কারও কারও এমনও ধারণা হ'ত—সাহিত্যের রাজদরবারে তিনি শুধু ভাঁড়ামি করতে চান। এমন কি—হায় হতভাগ্য দেশবাসী—অনেক পড়ার পরও এই ধারণা অনেকের যায় নি। তিনি মজলিসী গল্প বলতেন, আড্ডাবাজী ধরনে—সে কথা বলেও গেছেন বার বার—বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের তিনিই স্রষ্টা (সে কথায় পরে আসছি) কিন্তু সেটা আর যাই হোক, ভাঁড়ামি নয়। এ বিষয়ে তাঁর এক প্রিয়—অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, পৃথিবীর বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঁড়, একদা বিশ্ববাসীর ভোটে স্বীকৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় বা নির্মিত ছায়াচিত্রের সঙ্গে (এসব ছবির গল্প হয় উনি নিজে লিখতেন, নয়ত বেছে বেছে নিজের মতো কাহিনীগুলিই নির্বাচন করতেন, নয়ত কাঠামোটা বলে দিয়ে অন্যকে দিয়ে লেখাতেন) তাঁর রচনাধারার অনেক মিল আছে। চার্লিরও হাসিটা যেমন ঠিক হাসি নয়-কান্নারই ছদ্মবেশ, মুখোশ, অথবা কান্নাকে ব্যঙ্গ করা—সৈয়দদার রচনাও তাই, হাসিতে অশ্রুতে মেশানো, অশ্রুর মাত্রাই বেশী; কোথাও কোথাও তা এসেছে সোজাসুজি, কোথাও বা এসেছে হাসির আড়ালে, তামাশার মুখোশ পরে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ যা করেছেন, তার মধ্যেও ভাল করে (পড়লে) চেয়ে দেখলে দেখা যাবে—দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি বেদনায় ছলছল করছে।

যথার্থ কবিপ্রকৃতি ছাড়া এ সম্ভব নয়। তিনি কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সে নগণ্য; তাঁর অনেক রচনার ফার্সী গজল বা রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন (সত্যেন দত্তর অনুবাদ পেলে সে চেষ্টা আর করেন নি) কিন্তু সেও কাব্যরচনা হিসেবে এমন কিছু উৎকৃষ্ট মানের নয়। আসলে তাঁর সমস্ত রচনাই মূলতঃ কাব্য, কাব্যধর্মীয় গদ্য—কবিতার মতো ক'রে সাজালে গদ্যকবিতা হ'তে পারত। যেখানে যেখানে তিনি নিসর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সেখানে তাঁর লেখনী ছদ্মবেশও রাখতে পারে নি। যেমন, দু-একটি উদাহরণই দিই—

"বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উসকোখুসকো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড়

খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।...

"অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সকলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিক-টুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

"কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পুবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের 'ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পুবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপুরোর আমেজ।

"সমে এসে যখন পুব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকু মাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পুবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তার পর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

*　　　*　　　*

"দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন!

"তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে শিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

"সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরি, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!" [পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ১৬শ মুদ্রণ, পৃঃ ১১-১৩]

"পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যিই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ-খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা

দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশে নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

"পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'...

"পূব-বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব-বাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন-সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ায় কালো সবুজ; পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘন বেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব-বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ···কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?" [অবিশ্বাস্য, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ১০-১১]

কে জানে প্রথম যৌবনে বা কৈশোর বয়সে অতি ভীরু ভদ্র কোমল মন তাঁর—কোন প্রবল আঘাত পেয়েছিল কিনা, যার ক্ষত সারা জীবনেও শুকোয় নি—তা সামান্য দুঃখের কাঁটা লাগলেও তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমাদের এ অনুমানের কিছু সমর্থনও তারা রচনাতেই মেলে ঃ—

"আজ না হয় ঠাট্টা-মসকরা রঙ্গ-রসিকতা ক'রে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপন-চয়ন, তার বন্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলছি কিন্তু তখন, হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়?" [শবনম্, ২য় বিশ্ববাণী সং, পৃঃ ২৮]

উপন্যাসের নায়কের মুখেই বসেছে কথাগুলো—কিন্তু এ নায়ককে লেখকই নিজের সঙ্গে প্রায় একাত্ম করেন নি কি?

সম্ভবত তাঁর এই কবিপ্রকৃতি, বৈদগ্ধ্য এবং সত্যকার আভিজাত্যের জন্যেই তিনি পুরাতন 'সেন্স অফ ভ্যালুজ' বা মূল্যবোধের সমর্থক ছিলেন।

ভদ্রতা, শিষ্টাচার, মিথ্যা সম্বন্ধে ঘৃণা—সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা—আজ যে গুণ-গুলোর গুণপনা হারিয়ে যেতে বসেছে, যাকে পৌরাণিক যুগের 'ননসেন্স' বলে মনে করা হয়—সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচনাতে—যার অধিকাংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ—এই পুরাতন জগতের মূল্যবোধের, বিশেষত কৃতজ্ঞতাবোধের নিদর্শন অসংখ্য। সামান্যতম ঋণও, যা সে পক্ষ ঋণের কোন কারণ বা উপকার বলে মনেই করেন না—তাও প্রথম সুযোগেই উল্লেখ করেছেন।

আমরাও এসব বিষয়ে—বিশেষ জীবনের মূল্যায়নে—প্রাচীনপন্থী। (আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ পাঠকই তাই—নইলে সৈয়দদার বই এত বিক্রী হবে কেন?), সেইজন্যই এই গুণগুলি ভদ্রলোক মাত্রেরই থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। আর, কে না জানে সৈয়দদা সময়ে সময়ে যত বোহেমিয়ান জীবনই যাপন করুন না কেন—মনেপ্রাণে যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। He was a gentleman first, other things afterwards. অন্য গুণ বা দোষ তাঁর জীবনে পরে - অনেক পরে।

তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধেরই বড় নিদর্শন তাঁর প্রগাঢ় গুরুভক্তি। গুরুদেব বলতে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বুঝতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত (রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর অসীম অনুরাগ তাঁর প্রতি রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে—একথা যদি বলি, বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না) তার সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে মিশে ছিল। হয়ত এমন ভাবে দেহের অস্থিতে মজ্জাতে, প্রতি রক্ত-কণিকায় পর্যন্ত না মিশে গেলেই ভাল হ'ত। যখনই গুরুদেবের প্রসঙ্গ এসেছে তখনই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি—বোধ হয় তার চেয়েও বেশী—ভালবাসা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালই বাসতেন, বৈষ্ণবরা যেমন ভাবে তাদের ভগবানকে ভালবাসে—হয়ত সেই রকমই: সখারূপে, নাথরূপে।

রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে তাঁর সত্তায় মিশে না গেলেই হয়ত ভাল হ'ত—কথাটা বলেছি ভেবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তিনি সুফী সাধকের, পীরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে পেয়েছিলেন সেই সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁর শহরইয়ার উপন্যাসে শহরইয়ারকে তিনি বার বার এই কথাই বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। শহরইয়ার যখন স্বামী ছেড়ে সংসার ছেড়ে এক সুফী পীরের কাছে গিয়ে পড়ে থাকছে—তখন উনি (এ উপন্যাসের 'আমি' বা বক্তা লেখকের ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম, একরূপ) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, বার বার কতকগুলি বিশেষ রেকর্ড বাজাতে বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিভূত করছেন, প্রভাবিতও করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যেটি প্রথম ও বোধ করি সর্বাধিক জনপ্রিয়—সেই 'শবনম'এ তাঁর অজ্ঞাতসারেই 'শেষের কবিতা'র প্রভাব এসে পড়েছে। সুভাষিত কথার মালা গেঁথে গেছেন, সেটা ক্রমশ যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে। তাতে উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে। কাহিনী দানা বাঁধতে পারে নি তেমন।

বোধ হয় লেখকও সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, শেষের ট্র্যাজিক ঘটনাটি দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্ট করেছেন—তবু, উপন্যাস হিসেবে যতটা সার্থক হওয়া উচিত ছিল তাঁর মতো বহু-সাহিত্যদর্শী রসবোদ্ধা লেখকের পক্ষে, তা হ'তে পারে নি।

তাঁর উপন্যাস 'শবনম' ও 'শহরইয়ার' দুয়ের নায়ক তিনি স্বয়ং। শহর-ইয়ারে তো একেবারে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। এটা যেমন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—এমন কি 'স্টাণ্ট' বললেও বিশেষ অপরাধ ঘটে না—তেমনি বিপুল অসুবিধারও কারণ হয়েছে।

তাঁর উপন্যাস সুলিখিত ও সুললিত তাতে সন্দেহ নেই। বহু করুণ মধুর শাখা কাহিনীতে ভরা—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—পণ্ডিত মুজতবা আলী বার বারই এসে ঔপন্যাসিকের কলম কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বলবার কথা অনেক, বলবার অধিকারও যথেষ্ট—প্রবৃত্তিও, তাঁদের পণ্ডিতের বংশ, বহু পুরুষের ঐতিহ্য রক্তে তার কাজ ক'রে যায়—তাঁর মধ্যে একটি সত্যকারের শিক্ষক ছিল—তিনি যা জানতেন তা, পাঠকদের গ্রহণ-ক্ষমতা কত, আধারের পরিধির মাপ বিচার না ক'রেই জানাবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বস্তুত না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। তার ফলে কাহিনী বারে বারে হোঁচট খেত, কোথাও দানা বেঁধে ওঠার অবসর পেত না। তা সত্ত্বেও যে—শবনম ও শহর-ইয়ার—দুটি চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে, সেইটেই ও'র লেখনীর বৈশিষ্ট্য, ধার; ও'র অসমান্য শক্তির পরিচায়ক।

এই দুটি উপন্যাসে লেখক স্বয়ং নায়ক বলে তত্ত্বালোচনার মাত্রা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। অবিশ্বাস্য ও তুলনাহীনায় এই অসুবিধা নেই। বস্তুত উপন্যাস হিসেবে অবিশ্বাস্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক। এর নায়কের জীবনের সুগভীর ট্র্যাজেডি, তীব্র বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে। শেষের চিঠিটি একটু বক্তৃতা ও তত্ত্ববহুল, তৎসত্ত্বেও উপন্যাসের প্রকৃত গুণ বইটিতে বর্তমান।

বোধ হয় অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নায়ক ঐ সাহেব চরিত্রের মূল মানুষটিকে—অন্তত অনেকটা ঐ রকম—লেখক কোথাও দেখে থাকবেন। এর ট্র্যাজেডি, এর সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব—হয়ত কাল্পনিক, কোন তথ্যে নির্ভর ক'রে সে অনুমান গড়ে উঠেছিল—তাঁকে নাড়া দিয়েছিল, এ কাহিনী বহুদিন ধরেই মাথায় ছিল তাঁর, ভাবনার মধ্যে বহন করেছেন। টুনিমেম গল্পের ও'হারাই যে অবিশ্বাস্য উপন্যাসের ওরেলি তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এ কাজ তারাশঙ্কর চিরদিন ক'রে গেছেন, তাঁর বহু বিখ্যাত উপন্যাসই আগে বীজগল্পাকারে বেরিয়েছে।

মুজতবা আলী ঈশ্বরবিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্র—পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে অনায়াসে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও

অসাম্প্রদায়িকতা—অথবা বলা উচিত উদার দৃষ্টি ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা—তাঁর রচনার মধ্যে পাশাপাশি চলেছে বরাবর। এতটা কেউ ভেবেচিন্তে হিসেব ক'রে লিখতে পারে না, অন্তরের কথা, সহজ সত্য বলেই তা এমন ভাবে ফুটেছে।

তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন (যদিও বার বার আমাদের বলেছেন যে এ বিষয়ে তাঁর দাদারা 'জায়াণ্ট'—তিনি কিছুই নন, 'পিগমী'), মূল রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন, আমাকে একবার কথায় কথায় স্মৃতি থেকে শান্তি পর্বে ভীষ্মের উক্তি এবং দ্যূতসভায় বিদুরের উক্তির মূল শ্লোক কয়েকটি উদ্ধার ক'রে শোনান। তাঁর রচনাতেও সে প্রমাণ আছে। গীতা বেদ ভাল ক'রেই পড়া ছিল। খাঁটি মুসলমান হিসাবে ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তার পরই যে ধর্মের শিক্ষার ওপর তাঁর অধিক আস্থা ছিল—তা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এটা কথার কথা নয়, মুখোশও নয়। সে পরিচয় বলতে গেলে ওঁর রচনার ছত্রে ছত্রে আছে। পদাবলী কীর্তনের ওপর যার এত প্রগাঢ় অনুরাগ, রাধাকৃষ্ণর বিরহ-কাহিনী তাকে স্পর্শ করে নি—তা হ'তে পারে না।

তাঁর স্বভাবেই কোন কাপট্য বা হীনতা ছিল না। উত্তরকালে যারা শুধু তাঁর লেখাই পড়বে তারাও বুঝবে যে তিনি মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন—এবং কোন সংকীর্ণতা তাঁর থাকা সম্ভব নয়। আগেও বলেছি এখনও বলছি—তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বদা—ভদ্রলোক ছিলেন, ভদ্রতার সব রকম নিরিখে বিচার করলেও। যথার্থ ভদ্রলোক ও যথার্থ অভিজাত। এ বিষয়ে বংশপরম্পরা ঐতিহ্য তো ছিলই—তার ওপর পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ—অন্য রকম হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, 'বড়বাবু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর তাঁর যে অসীম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল—যার পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি তাঁর সঙ্গে আলাপে আড্ডায়—যার পরিচয় তাঁর বহু রচনায়—অপরিমাণ ভক্তি—হয়ত বা, যাকে ইংরেজীতে বলে awe তাও—তাতেই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠন ও গতি কোন্ দিক ঘেঁষা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ, কোন মালিন্য তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারত না, সম্পূর্ণ অহিংস—যে কারণে মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অন্তরঙ্গ-আত্মীয়তা-সূচক বড়দা বলে সম্বোধন উল্লেখ করতেন—আর ঠিক সেই কারণেই তিনি অবৈষয়িক অসংসারী ছিলেন, ফলে সাধারণ লোকে তাঁকে বদ্ধ পাগল ভাবত। এই লোককে যিনি ভক্তি করতে পারেন ভালবাসতে পারেন—(সে প্রমাণ তাঁর প্রখ্যাত রচনা 'বড়বাবু'তেই পাবেন পাঠকরা)—এঁর রচনা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে পড়েন ও মতের মূল্য দেন—দ্বিজেন্দ্রনাথের 'গীতাপাঠ' বইখানি তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে রাখা থাকত দেখেছি—যিনি এঁর মতকে সুফী-সাধকদের সঙ্গে তুলনীয় মনে করতেন—তিনি নিজেও কিছুটা অগ্রসর বৈকি!

তাঁর অন্তরে শুদ্ধ-সৎ চিন্তার, ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা পাবক বহ্নি ছিল

—তার জন্যই যেন কোন আবর্জনা মনে জমতে পারত না, কোন অভ্যাসের দোষ তাঁর মনকে আবিল ক'রে তুলতে পারে নি। Self-purifying স্বতঃশোধনশীল উচ্চচিন্তাই তাঁকে চিরদিন পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে এসেছে। এই নির্মল মনের জন্যই তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোন জঘন্য চিন্তা কি যৌন-মিলন-চিত্র স্থান পায় নি, গল্প বলতে বসে অমল পবিত্র প্রেমের কথা ছাড়া ভাবতে পারেন নি। 'অবিশ্বাস্য'তে ব্যভিচারের কথা আছে—বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন বা তার অভাব, অভাবের ফলে ব্যভিচার—সমস্ত কাহিনীটার মূলে এ কথাই—তবু বই পড়ে শেষ করলে কোথাও আধুনিক মার্কিন (আমাদের দেশেও সে প্রবল বাতাস এসে পেঁাচেছে) উপন্যাসের মতো আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। দুটি নিরপরাধ জীবন কী ভাবে ভাগ্যের হাতে অকারণ অকরুণ মার খেল—সেই বেদনাতেই পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, যৌন জীবনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না। এ-ই তাঁর জীবনদর্শন। অন্তত অনেকখানি।

সৈয়দদার আগে বাংলাসাহিত্যে রম্যরচনার একেবারে অভাব ছিল না। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়-দের রচনা হাস্যরসমধুর হ'লেও এগুলি আসলে রম্যরচনাই। যাযাবরের তো কথাই নেই। তাঁর 'দৃষ্টিপাত' রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিলীপকুমার রায়—যিনি belles Lettres 'বেলে লেৎরস্'কে মঞ্জুভাষা নামকরণ করেছিলেন—তিনিও অনেক রম্যরচনা লিখেছেন। এঁদের কাছে বাংলাসাহিত্যের ঋণ অনেক। রাজশেখর বসু ও তাঁর পূর্বাচার্য অসামান্য শক্তিধর ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়—যিনি সে আমলেই একটি গল্পর জন্য পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা আদায় করতেন বলে শুনেছি—এঁদের আবির্ভাব অপ্রত্যক্ষভাবে সৈয়দ সাহিত্য-রচনার মূলে অনেক রসদ যুগিয়েছে। তবে মুজতবা আলীর লেখাগুলিতে রম্যরচনা ও রসসাহিত্য ছাড়াও কিছু আছে। একে কী নাম দেবেন - 'আড্ডাসাহিত্য' বললেই ঠিক বলা হয়, 'মজলিসী সাহিত্য' বললে অভিধানটার ওপর একটু পালিশ পড়ে। এই মজলিসী ঢং—অপর কেউ কেউ চেষ্টা করলেও—পরিপূর্ণ মজলিসী রচনায়—মুজতবা আলী বাংলাসাহিত্যে একক ও অনন্য।

'গালগল্পে'র মেজাজে, কর্মহীন অবসরের অলস উদ্দেশ্যহীন আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও কথাগুলি অনেক কাজের কথায় ভর্তি; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চা ও সার্থক বিচার-সমালোচনায় ঠাসা। আগেই বলেছি তাঁর মধ্যে একটি শিক্ষক ছিলেন, আলীদার স্বভাবে সেটাই প্রধান—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে সেই শিক্ষকতা নাই—যাকে সহজ বাংলায় মাস্টারী বলে—প্রবল ও অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। রসগোল্লা দিয়ে শটকে শেখানোর মতোই আড্ডাবাজী হালকা 'গল্পে'র সুগার-কোটিং বা মধুপ্রলেপ দিয়ে আমাদের অনেক মূল্যবান শিক্ষণীয় তথ্য ও সত্য শেখাতে জানাতে চেয়েছেন। বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি, বহু লোক দেখেছেন—পণ্ডিত, গুণী, রাজনৈতিক থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষ—এই সাধারণের সম্বন্ধেই প্রীতি-ভালবাসা বেশী ছিল তাঁর—

সে অভিজ্ঞতাও কম নয়, গল্পের মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার শাখাপ্রসঙ্গে সেই বিশাল, আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎকে জানতে বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতায় ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু হতাশ হন নি, হাল ছাড়েন নি।

[এই জানবার চেষ্টা এত বেশী ছিল যে আমার মতো সামান্য লেখকের কোন কোন রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় কোন শব্দার্থে বা শব্দপ্রয়োগে ভুল থাকলে গরজ ক'রে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুরাগ দেখে—বিশেষ মুঘল আমলের ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে—তিনি আমাকে Wollaston-এর মহামূল্যবান য়্যাংলো-পার্সিয়ান অভিধানটি কিনতে পরামর্শ দেন। এবং আমি পেয়ে গেলে কৃত্রিম পরিতাপ প্রকাশ ক'রে একটি সরস চিঠি দেন, কারণ বইটি তিনিও খুঁজেছিলেন, পান নি।]

তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নেন নি, পরোক্ষ ভাবে অনেক নিয়েছেন। তাদের মূল্য বুঝেছেন বলেই সেই চলা-পথ ত্যাগ ক'রে নিজের পৃথক রাস্তা ক'রে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু তাঁর দ্বারা খুব বেশী লেখক প্রভাবিত হ'তে পারেন নি। তা বোধ হয় হওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তর সাধক বলতে গেলে একটিই—রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ। তবে শংকরের অপ্রত্যক্ষ ঋণ কিছু আছে। অন্তত মুজতবা আলীর আবির্ভাবের আলোয় তিনি নিজের পথ, নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

সৈয়দদা একটা কথা বার বার বলেছেন যে, রোজগারের দুশ্চিন্তা না থাকলে তিনি কলম ধরেন না। তাই যদি হবে, এতই যদি অর্থ সম্বন্ধে সচেতন তবে রোজগারের সিধা সহজ রাস্তাগুলো—ভাল ভাল চাকরিগুলো ছাড়লেন কেন? এই প্রশ্নটাই মাঝে মাঝে মনে জাগে। এত বড় লেখক—এত শক্তিমান, যিনি রচনাবৈশিষ্ট্যে আজও অনন্য, তিনি কি সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য রচনার প্রেরণা কোন দিন অনুভব করেন নি—সৃষ্টিযন্ত্রণা যাকে বলে? লেখবার, নিজের বক্তব্য বলবার তাগিদ? বিশ্বাস হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বার বার সেই কথাটাই মনে হয়—জীবন প্রভাতে কোথায় একটা কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন সীমাহীন আশাভঙ্গের বেদনা—তাই আশা বলতে উদ্যম বলতে সার্থকতার স্বপ্ন বলতে আর কিছু তাঁর ছিল না। জীবন, প্রতিভা, যশ, সমস্তগুলো সম্বন্ধেই একটা সীমাহীন ঔদাসীন্য, apathy এসে গিয়েছিল। স্থায়ী যশলাভ বা অমর সাহিত্য রচনা করার কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করতেন না। তৎসত্ত্বেও যেটুকু আমরা পেয়েছি সে নিতান্তই আমাদের, সাহিত্য-পাঠকদের ভাগ্য, সাহিত্য-সরস্বতীর করুণা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পঞ্চতন্ত্র

(প্রথম পর্ব)

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

মহাশয়ার করকমলে—

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা রবিবারের 'বসুমতী' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। অনুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু কেন যে এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বাধ্য করলেন সে কথা সহৃদয় পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুজতবা আলী

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভুগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়সা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের

পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

*　　　*　　　*

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়,

জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরশা হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমিন স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের

মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙ্গালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড়

যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে "গঙ্গাস্নান" যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে

তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সকলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজ্‌ন ইংরিজী সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না। আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন। 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু' আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা

আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কর্নেপক্ষের প্যাঁচে পাড় বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ! সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি, —শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুডে-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল —অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেনথে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী-বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে?' ও কি পাতলুম না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেইরকম পূর্বের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পেঁছিতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক-একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পাঁয়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। একসঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান; একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে জমে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-থেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সব-সুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামে নি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঙ্গায়, যেন, ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সক্কলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর

তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পূব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাসে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝিঁ নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পূবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূরে সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্ব-সংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখলে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়বে না!

* * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশী। সে খুশী তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপচে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা-শুধু পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখীর মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—কেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা

কখনো কইতে শুনি নি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আডায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে-বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেলে চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!

আহারাদি—

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজী শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বর-ব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজী উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুরগীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যে রকম রান্না করে ঠিক

সে-রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়ত আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতী দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকী ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কি তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবারের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানতঃ ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপীয় রান্না সাধারণতঃ মশলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান—মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলংকার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল

বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা ; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্হাপুর রাজ্যের সরকারী অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোন বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জরদ্ চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্সট-মীটে'র পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজী রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটা বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশী চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি ?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই কয়েছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা ॥

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই ড্রিংক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডুষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অভিমত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফের্তা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজী' নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দী-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দী-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে? নেতাজী তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভাতে হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক – এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতা বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে

দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালী থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যান্ডা' করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনীকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

এই ইন্দ্রজাল কি করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে. জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে।

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল

—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না।

"জিন্দাবাদ নেতাজী"।

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনাশক্তি, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ হঠাৎ, এঁদেরই একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মসিয়ো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়। এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁয় তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ডে বিস্তর সানাটরিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মুখে একই কথা, 'যক্ষ্মার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশী হলেন। বললেন, 'আপনি যখন এ তত্ত্বটা জানেন তখন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।' তবু আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুনয়-বিনয় করে গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পায়ে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম যে ভোতিয়ে মুসসোলীন এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতুম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ংকর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানাটরিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমন কি মোটরও সেখানে পেঁছিতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানাটরিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশী।

মসিয়ো ভোতিয়ে, মাদাম, এমন কি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে

এই সানাটরিয়ামেই ! তারা সুস্থ। শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায় খেলাধুলা গল্পগুজব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ডরাব কেন ?

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। বরং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা খাটানো রয়েছে কলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশী। আপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান,—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি ? খাবো কি ? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে ?

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মৎ হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা ? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানাটরিয়াঁ ইউনিভের্সিতের', অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুধুমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত যেন আমাদের রোগীদের টার্ম' হিসেবে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানাটরিয়ামে। এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নিমন্ত্রিত রবাহূত গুণী এখানে এসে দুদ'শ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশী খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশী কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি, কোনো কিছু একটা নিয়ে পাশ দিতে পারলেই ; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বড্ড বেশী না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরাও তত্ত্বটা বুঝে ফেলে, আর নূতন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাকে তো আজকাল

এ-নিয়ে বিলকুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশী সময় দিতে পারি।'

একটুখানি চোখ টিপে মুচকি হেসে বললেন, 'পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন, আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি. এখানে মধ্যযামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশী পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তো আর হৃদয়হীন পাষাণ নন; এখান থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকী টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অঢেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুসোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেঙেছি।

'এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইণ্টারনেশলাল—সার্বজনীন সার্বভৌমিক করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্য যেন এখানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো রাজা মহারাজদের অনেক টাকা— দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনেছি।'

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এককালে রাজ-রাজড়ারা বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারেই নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—'

ডক্টর ভোতিয়ে আমার দু'খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলুম! তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইট্জারল্যাণ্ড ছোট্ট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি। কিন্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

* * *

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের লেজাঁ নামক স্থানে যে 'আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইট্জারল্যাণ্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ-প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক। কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তাবাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে

দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভোতিয়ে নিরুপায়। তাই আমার বিশ্বাস, যতদিন সুইট্জারল্যাণ্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ-দেশে আমাদেরও চুপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশেই বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশী; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোন দেশেরই তুলনা হয় না। অস্মদ্দেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সজ্জন সম্প্রদায় আশা করি কথাটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে মাদৃশ অর্বাচীন জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত, যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটে পাঁচজনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর 'আরোগ্য-বরমে' যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো তো আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মামুলী সানাটরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানা দেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানাটরিয়াতে এ রকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পৌঁছবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েছিল! তাই বোধ করি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুজি বললেন, 'আপনি একটা লেকচার দিন। জর্মন কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়!'

আমি বললুম, 'আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসী এবং আপনি ফরাসী ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়নের মত 'অসম্ভব' কথাটায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা 'অসম্ভব' নয়; আমি কিন্তু ফরাসী নয়, আমি 'অসম্ভব' কথাটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।'

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক বিরাট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দু'হাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে,

'এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন ?'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলুম,

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

* * *

ঝট্‌পট্‌ ইশ্‌তিহার বেরিয়ে গেল 'ভারতীয় অমুক কাল সন্ধ্যায় লেজার 'সানতরিয়া ইউনিভের্সিতের সুইসে' একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়……। লেজার তাবৎ সানাতরিয়ার অধিবাসিবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে।' অর্থাৎ ভোতিয়ে সাহেবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেনই, অন্যান্য সানাতারিয়ার আরো বহু দুশ্‌মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরি নি।

ভোতিয়ে বললেন, 'চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।'

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পুজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করে ঠোঁট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যিখানে বেশ খানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বেঞ্চি পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে—আমার ছট্‌ফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে ? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ? গর্দিশ, গর্দিশ, সবই কপালের গর্দিশ।

ভোতিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বুঝলুম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্‌বর ধরনেরই হবে।

ফ্রম থর্ন টু থর্ন অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল চেয়ারে করে। জন দুই শুয়ে আছে লম্বা লম্বা কৌচ সোফায়। পরে জানলুম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে 'ইয়ার ফোনে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গর্দানে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয় ?' ভোতিয়ে বললেন, 'ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়'। আমি বললুম, 'অর্থাৎ ?' অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত! অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি বলে এখন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরেদরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জউরি। "ব্রায়ার" ছাড়া

অন্য কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না।'

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখচোখ। আদপেই না। আপেলের মত লাল গাল প্রায় সব্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা। যার দিকে তাকাই সে-ই যেন আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, 'কি ভয় তোমার ; এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো।'

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ত্রাণ করার জন্য।

তারপর কি হল ?

তারপর কি হল ? ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছে ; আর আজ যদি আপনাদেব কাছে স্বীকারও করি যে তারা বক্তৃতা-শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না।

আমি কি বলেছিলুম ?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হপ্তায় শোনেন। নূতন করে বলে আর কি লাভ ?

ইস্কিলাস— শেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউণ্ড—শৃঙ্খলবন্ধ প্রমিথিয়ুস। ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এই :—খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার। নাটকের মূল গল্প হচ্ছে : প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা সাত-রাজার-ধন-মাণিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে। দেবরাজ জুপিটার ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেক পুঁতে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাস্তায় চলেন। প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন। জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশী খুশী—স্বর্গরাজ্যে ধর্মরাজ্যে পরিণত হল।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্মনীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কি না জানিনে কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল। দেবতাদের হুমকির ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু'হাজার বৎসর ধরে যাদের বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ানো হল,

তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয়ঃ যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা, কোনো ত্রুটি লুকানো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কবি শেলি। তখনকার দিনে রূঢ়ার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে অস্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুলিসমেন অর্থাৎ পাদ্রী পুরুতরা তখন শেলির পিছনে জুপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলেঃ শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ানো হয়. শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন. শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনেছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি তাঁর বুকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার-জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গভীরতম হুঙ্কার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত দ্বিতীয় কাব্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সুর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করে নি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বরচন্দ্রকে তো অনেক বেশী কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেয় নি। তবু হয়তো হৃদ্যতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সনাতন ধর্ম বর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি অন্য চরিত্র না নিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোন দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেবনরবানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সর্ব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যে, সেখানে যে শুধু সমস্ত পৃথিবীর

মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বদ্ধপাগল এমন সব চিৎকার কলাবৎকে প্যারিস সয়ে নিল যাঁরা আপন দেশে থাকলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ পাগলা গারদের ভিতরে জীবনের বেশীর ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এ সব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিস আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারন যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে নারীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্টপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্জারল্যাণ্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উণ্ট এপিমেটয়েস (Prometheus und Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয় নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। কলকাতা বুকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড় দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্নাভাবে মৃত্যুভয়েকাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালী স্পিটলার ? ?

মোপাসাঁ—চেখফ্—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুনেছি র‍্যোন্টগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শুধু ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, র‍্যোন্টগেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বন্ধ্যাই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্লবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত।

ফ্লবের যে কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু ফ্লবেরই। ভলতেরের পরেই ফ্লবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলেও বাংলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্লবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্লবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেরের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, 'ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি ?' ফ্লবের এ কথাটা বললে মানাতো আরো বেশী—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধুয়ে মুছে কেচে ইস্ত্রি করে পাট না করা পর্যন্ত ফ্লবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্লবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম র‍্যাঁদা চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অদ্ভুত ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাৎলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ো না—অর্থাৎ ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্তলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি ? মোপাসাঁর পূর্বের লেখকরা কি বর্ণনা, কি চরিত্র-বিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই লিখতেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংযম দরকার, বিস্তর কথা

অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতির প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বাঙ্গ বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাসাঁর পূর্বে ফরাসীরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কল্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দাটা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত 'উদার' নয়।

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্-খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জায়গায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজিতে যাকে বলে 'ক্লাইমেক্স্'—এইখানে মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক নায়িকাদের জন্য এতটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে 'পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল' অথবা 'অনুতাপের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিল'।

ক্লাইমেক্স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এন্তার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়েও ভালো লিখেছেন ; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ 'চেখফ্') প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা 'বুমস্-প্যাঙ' করে সশব্দে ক্লাইমেক্সে এসে অরকেস্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্লাইমেক্সে শেষ হয় সত্য ; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পই যদি পাঠক ক্লাইমেক্সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দুই ছত্রে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চোখফের বহু ক্লাইমেক্স্-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্লাইমেক্সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাষার দিক দিয়ে চেখফ্ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। যান। টলস্টয় ফ্লবেরের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং

গর্কির চেয়ে চেখফ্‌কে পছন্দ করতেন বেশী—তিনি নাকি একবার গর্কিকে বলেছিলেন, চেখফ্‌ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগুলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটাল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে মোপাসাঁরই মত ঠাস বুনুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হরেদরে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপন বৈশিষ্ট্য বর্জন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্‌ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা, শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামাতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তো নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাই নে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শেলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনির্বচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'মিস্টিক' কথাটাকে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্থল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অদ্ভুত এবং বেতালা সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন কথাসাহিত্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিস্তার অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। কদম-ফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাট্টু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, তবু নিষ্কর্মা কদম-ফুলেরই দাম বেশী।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশী সময় নষ্ট করেন নি বলেই বোধ করি বাঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলুম বাঙলা সাহিত্য বেতালা সাহিত্য ; গীতিকাব্যে যেন যে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এঁদো কুয়োর ভেতরে খাবি খায়।

অথচ ঊনবিংশ শতকে শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদ সাহিত্যের রচনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি সে দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হ'লই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন সাহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতিকাব্যে যে সাহিত্য তেইশটে ডবল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহান্নটা ডিগ্রেডেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে শুধু ফরাসী বই বিক্রয়ের জন্য দোকান হয়েছে—সত্তর বৎসর আগে ছিল না।—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে যেটুকু শরবৎ আজ বিলোনো হচ্ছে তার আগাগোড়া ইংরিজী থেকে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী সাহিত্যের উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ক্ষান্ত দেন নি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিরাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত থেকে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক। উপস্থিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শুধুমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালীর হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অদেখা বা অল্প-দেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন

না। সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দু'টো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুভ্র মল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়,—রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার ; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যাণ্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসী ভাষায় এঁকে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এই-রূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে ! মনে হয়, একসঙ্গে যেন পঞ্চেন্দ্রিয় রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে।' অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না।

স্বীকার করি, ইংরেজ-বর্জিত-ভারত' ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)। 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের অনুবাদশশাঙ্কে ঐ একটি মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকী পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সে-স্বর সে ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভরত-নাট্যম দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্রোধ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব ক'টি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো মধুর বীণাঝঙ্কারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝঙ্কার, প্রতি ব্যঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহ্বল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তন সত্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অদ্ভুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ-সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজী উপন্যাসের অনুবাদে। ঘোমটা আর 'ফিলমি গানের' সঙ্গে তার মিতালি ॥

'কলচর'

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অদ্ভুত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি 'কলচরে'র সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে ; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্‌ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে

পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র, কি গ্যোটে সর্ব যুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা ; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্‌' নই আমি পালাব কেন ?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্‌ কোন্‌ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সুক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সুক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিক চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মাধ্যিখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্‌' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি ?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি ? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা

খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ও'রা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্‌' নই, তাই বলতে পারব না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই।

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক' ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধুলা সরানো দুদশটা হোজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোন প্রকারের মুক্তিস্নান নেই ?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চারা, এমন কি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে।' গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্‌ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানী ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবী ভাষায় মৎর্‌ (বৃষ্টি) শব্দ আছে ; কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্‌ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ

অজানা।

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল; আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয়' বেসুরো বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ'আনা, কেউ দু' আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মুশকিল! ভাবখানা অনেকটা;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি বাস্কেল ইণ্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি? আর দ্যাট্ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সে-ই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সব চেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসেব বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মুশ্কিলে পড়লুম। জুৎসই কি উত্তব দিই। মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাব বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এবা আমাকে খুন কববে; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদেব সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে?'

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন?'

শরিফ মুহম্মদ বললো, 'সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না।' আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে

ঘিরে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশনড হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি তাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

আমাকে তখন আর পায় কে? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ কারে কয়, সে-কথা কি করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে?

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস শূদ্রক যে বিরহ-বর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোন সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা!!

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে:

"In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fiuestern "Monsieur,
ich bin Dein,—"

অর্থাৎ:

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি!
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে!

ইংরেজীতে বলে, 'কেরীং কোল টু নিউ কাসল', হিন্দীতে বলে 'বরেলীমে

বাঁস লে জানা' (বেরলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশীর ভাগ সামোভার তৈরী হয়), গুজরাতীতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসীতে বলে, "প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া !'

ফরাসী প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া ? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্ততঃ একবারের মত প্যারিসে যাওয়া ? এমন কি যে জর্মন ফরাসী জাতটাকে দু'চোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসীনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ ইসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চাযি্য বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্ হিরণ্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমতঃ, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন ?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে —অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু ? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া ? হবেও বা।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসী মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশী বিদগ্ধা। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসীনী যমদূতের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যাণ্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসীনীর

চেয়েও বেশী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যাণ্ডার' (আউটল্যাণ্ডার) বা 'বিদেশী'ই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসীনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসী, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসী বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসীনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট,' তবে ফরাসীনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসীনীর বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসীনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবে না।

কিন্তু ফরাসীনীর সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দৃষ্টিকটু রুচিবিরুদ্ধ বলে – নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসীনীর কাছে টেস্‌ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশী বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাই নি তবু সমস্যাটা একই। ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথহারানো'র মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ'!

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে। বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রদ্দি উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকানে মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য,

চিবোবার জন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো· অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ,' ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর,' 'লোধ্রেরেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে। নাঃ। আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিছু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে টাইপ রাইটারের হরফ সাজানোর মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছেমত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসী হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মুরুব্বি মানি। তারই ভাষায় বললুম, সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসীতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?' —অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসী ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলেছি সে কথাই স্মরণ নেই – গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জর্মন ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagt "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja". অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, নো', কিন্তু তোমার চোখ দু'টি বলছে 'হাঁ হাঁ'।

কিন্তু ফরাসী জর্মনির দুশমন। জর্মন যা করে ফরাসী তার ঠিক উল্টো করাটাই জাত্যভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'না' 'নো' —অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরেজী বুঝতে পারছেন না। মহা মুশ্‌কিল।

হঠাৎ কখন ফরাসী রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধ হয় কিছুটা ফরাসী বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসীতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালীর জাত্যভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমন কি ইংরিজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসী তানপুরোটার তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসী শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসী জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু

ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পায় কে ?

আপনাদের আশীর্বাদে তার শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজী যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—'পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।'

বুঝলুম কথা সত্যি। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা ?' আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসীরা কি ভাবে তার পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলুম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমার স্মরণ করিয়ে দিলে, কলম 'ফুরিয়ে গিয়েছে'। আরেক দিন হবে।

কিসের সান্ধনে

হটেনটট্‌দের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, 'যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো ?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেন্‌টটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম।

আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যাকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যালাভ করতে যাব কোন্ দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লণ্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কম্বোজ, বল্হীক, তীব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই এই ভারতবর্ষের লোকেই ধেয়ে চলেছে ইংলণ্ডের দিকে 'বিদ্যালাভে'র জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলণ্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা-মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলণ্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলেণ্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলেণ্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলেণ্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারে নি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কাণ্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলেণ্ডে জন্মায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালী, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী, এলাহাবাদ, আমেদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিন শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলেণ্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলেণ্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি

যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাব-বশতঃ তারা যে তখন কুপোদকের সন্ধানে যেতো তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশী। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দু'-জনেই তাই কুপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠক মাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশী প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারি নে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলেণ্ড বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, মুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালীর ট্যাঁকে এত বেশী কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মন ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরির বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালী কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরে-সুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেণ্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি। আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদিস্যাৎ আপনি একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্রবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি,

মসিয়ো—এ ছবি দেখিবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছে বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশী দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটা কয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেয়ালাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম 'কপালী' মানুষ বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভিক্ষে মাঙছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন্ দূরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এক কাপ কফি খাবেন';

ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবে কি খাবেন?'

একটি কথা বললো 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্ম-হত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীশিখা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চীৎকার করে করে শেষটায় ভিরমি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছফ্‌ফট্‌ করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটা তিনেক অর্ডার দিয়ে ঝপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটা চারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্‌, গে ভেক্‌, ভিৎ ভিৎ।' ক'টা ভাষায় যে সে আমায় পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম— নট নড়ন-চড়ন—নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক'টি ভাঙিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফের্‌শট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষার তুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, 'ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টার কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল?

যামিনী রায় ? এনারা সব আর্টিস্ট । কচু !'

আমি তবু চুপ ।

বললে, 'অ-অ-অ- । সেজান্ রেনোয়া গোগাঁ, আঁরি-মাতিস ? বল্ না রে ছোকরা ।'

আমি পূর্ববৎ ।

'তবে শোন্ ছোকরা । এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি । আমার কথা শোন্ । আর্ট জিনিসটা কি ? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচর শোনালে । সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে । সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যিখানে গ্যোটেকে খুব একহাত নিল । তারপর বদলের, মালার্মে । শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে ।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ ক'রে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনি নি ।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহুঁ ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া । একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলি নে । তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে ? অশোকস্তম্ভের সিংগি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেণ্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস, নটরাজ ? বল্ না ?

তারপর ছাড়লে আরেকখানা লেকচর । দুনিয়ার কোন যাদুঘরের কোন্ কোণে কোন্ মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে ।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল । এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে ।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না ।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল ; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে ?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে ।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো ।

'তা তো শিখবি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ ? তার কি হবে ? নানা প্রকারের ব্যামো ? তার কি হবে ? অদ্ভুত অদ্ভুত নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ ? তার কি হবে ?

* * *

এই হল মুশকিল । আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ংকর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক

মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছিনে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি ? ?

ভক্তি

ভক্তি ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে অনির্বচনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এ-ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচী এখনো আপন ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন নিয়ে এতই উদ্ব্যস্ত যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান ধর্মে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত যে, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃস্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন নিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যয়ে সেটি প্রধানতঃ একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরুণ এমন কি বদরাগী এবং খাম-খেয়ালী রাজার রূপ ? তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তৃপ্ত হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেন্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃস্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। 'আওয়ার ফাদার উইচ আর্ট ইন হেভ্‌ন্।' এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মুক্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়মান হতে চায়। পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠলো, "ধন্য হে জননী মেরি,

তুমি মা করুণাময়ী।”

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানতঃ মা-মেরিরূপে। এ পূজা ‘আভেমারিয়া’ মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খৃস্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেণ্ডেলজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রে সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন।

‘উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্য সিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।’

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে যখন বলা হয়েছে “For, love is stronger than death” তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন। তাই মানুষ বিচার করল, ‘ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতারূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভরূপে, প্রেমিকরূপে।’

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে। কিন্তু ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints)-ও যে এ-রকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সন্ধান আমরা কমই রাখি,—কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ প্রটেস্টান্ট ধর্মের সঙ্গে। ঈষৎ দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না :—

O Night, that dids't lead us thus,
O Night, more lovely that dawn
of light,
O Night that broughtest us
Lover to lover's sight
Lover with loved in marriage
of delight!
Upon my flowery breast,
Wholly for him, and save himself
for none,
There did I give sweet rest
To my beloved one;

The fanning of the cedars
breathed thereon
When the first morning air
Blew from the bower, and waived
his locks aside,
His hand with gentle care,
Did wound me in the side,
And in my body all my senses
died.
All things I then forgot,
My cheek on him who for my
coming came ;
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting
them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান খোয়ান দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা অধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল ? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড্ডীয়মান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন, 'বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বার প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালীর রাধা বিবাহিতা, —সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ী-ননদী শঙ্খ-করাতের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণরাধার মিলনে—

যদেৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সন্ধান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর।

তাই ইরানী কবি সুর মিলিয়ে গেয়েছেন :—

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্
তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈ মন্ দিগরম্
তু দিগরী।'
আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন।

* * *

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত শাখা-প্রশাখা। কত ধ্বনি, কত সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সান য়োয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে। কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না। অর্থের সন্ধানে, স্বার্থের অন্বেষণে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না ! !

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সে সব শব্দ তৈরী হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যেগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব-ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জে'র মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা !!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মত বলে, "ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী !"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো ? —দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবী 'আমীর-উল-বহর' থেকে, 'চেক'

(কিঞ্চিন্মাত্রের) নিয়েছে ফার্সী 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দী থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ বাবদেই ; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নিকষ্যি কুলীনের মত উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার ? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না ; আমরা তাকে খুশী করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেন্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লণ্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসী রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজী হবো না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম ; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্ট-ভাফ্ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্ট-ভাফ্ফে, লুফ্ট-ভাফ্ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না', ব্লিৎসক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন "স্বাধিকার-প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার- গিরার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত ডোণ্ট থ্রো ইয়োরসেলভস আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম'। 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উঁহু বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কি করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসী চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আব্‌ছা আব্‌ছা করে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশী বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমঝোতা হল।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle!

শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কি!

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধ ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে ট্রেনে

বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle!

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কি।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মত দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ঙ্কর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরেজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজী রবরের মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজী beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশী 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে'র প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশী লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্কারা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেন নি। 'ড্রাগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen' mischun-

gverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য,' 'পুনরায় দান,' 'সর্বভৈষজ', 'এক-সঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদানসর্বভৈষজসংমিশ্রণ-শাস্ত্রজ্ঞ'।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফত্তেমা' জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমত আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি বা আমরা বানাই তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চললো না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করি নি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সেকথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজী ফরাসী কেঁদে-কুকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাই-ব্রাও' 'রাঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না —সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে,' দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন ঃ—

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখী,
দক্ষিণের 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা'
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাঙ্গলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া,' 'হতভাগা' নয়! শুধু হাতীর মত আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে

মার্জারনিধন কাব্য
বা
গুরবে কুশ্ তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্নী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শিদ মস্তান্
কোম্পানী কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এন্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্‌কৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ ॥
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোরা রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন সে করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্‌
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্‌?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।

পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসাড়ে শুনে পুণ্যবান ॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি গিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নেই কেন ?
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই ?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি ?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি ?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়।
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্সো কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'

তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি ?”
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

“ক্যাবাৎ”, “ক্যাবাৎ” বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পে'ৗছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর‍্যা হুঙকারিয়া কয়
“ভবিষ্যৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।”
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ॥
হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
“ভবিষ্যৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয় ?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।”
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পে'ৗছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল, “ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।”
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।

বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছে" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসলে এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বাঁধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

* * *

মল্লিনাথস্য
স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল ॥*

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল, পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়ে নি। রাস্‌ল্‌ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্‌ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক্‌ আর চীনে বেদেই হোক্‌।

পণ্ডিত নই, তাই চট্‌ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রূপালি ঝরণাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস্‌ করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্‌ কথা বলেছেন ॥

* * *

---

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তরে বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরুবে কুশতন, শব-ই-আওওয়ল' অর্থাৎ গুরুবে=বিড়াল, কুশতন=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলায় 'পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল।'

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনি ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপাবাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফে-ওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আমার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড়গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডোল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসি মুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার ? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা ? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি ? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না ? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউখেলানো। নিজের চোখে দেখনি কখনো আয়না দিয়ে ?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো !'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি ; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না—হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি ? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না ?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা-না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল'। জিজ্ঞেস করল, তুমি ভারতীয় নও ?'

আমি বললুম, 'আলবাৎ !'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভুঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন', তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয় ? ?

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা ; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কাত্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন ; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো ? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি আবার যখন ল্যান্ডলেডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভাল জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে ? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ

আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি "জার্নালিস্ট" তাহলে তার মানে কি হল?'

একগাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, "আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে", তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, 'তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল্! তার মানে হল, "আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন।"

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, "এবার তুমি এসো" তখন তার অর্থ "তুমি এবারে কেটে পড়ো।"

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাঁইটে রাজনৈতিক মাঁসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেন্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এইরকম ধারা কত কি? আমি খবরটা শুনে বললুম, "বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।"

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন? স্রেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নাড়ী-ভূঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রূপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—' বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙক ইউ, থ্যাঙক ইউ।'

তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্থ উত্তম সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়ালটস নাচের নবীনতম "অবদানগুলো" রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মঁসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডো কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা

হলে নর্তকী কি কি একটুখানি মোলায়েম হবেন না ?

আমি অবিশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই নি। মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধু চাই একটুখানি খবর।

কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু ঘোড়া না চড়ে আড়াই শ'টা চড়ুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশী।

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, "নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না।"

অনুস্বারে জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলেন আমিও কাঁচা নই।'

তাপপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিট খানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না ?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ "না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট"। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম ॥

সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেন্টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব

কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্টিস করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না ; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকুরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দরোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ', ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-সুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।'

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সায়েব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, 'হোয়াড্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হয়েছেন।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পেঁছিতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিউটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে

গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মোরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত-স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুগেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট,! দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু,' 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত

গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি ?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল।

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো ?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার! বাপরে বাপ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন 'ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ!' দশ লাখ ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরু পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে। মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে ? বউকে ডরাও না বুঝি ?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে,

হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি ? ?

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি' সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোন মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা দেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতনে নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করবে না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন-কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্‌স, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সব কিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,
আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লীডার' কিংবা ইরানীরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে ঃ

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পেঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে বসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে'। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে'।

'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,

কোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥'

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা —মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাব-খানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেণ্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তন্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্ব শেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো

কিছু অন্যায়ও নয়।

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখখুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি। মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্থানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য। সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ ॥

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।' ॥

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লি শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুৎব্ মিনারের গায়ে লাগানো কুওৎউল্‌ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম 'বর্ণনা' এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এ তো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার-প্রকার দেখলেও মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে

নির্মিত হয়েছিল। মনে ক্ষণমাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোনো দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎব্‌মিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, গিয়াসুদ্দীন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ, এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদরজঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে বাঁচতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসী গুণী ক্লেমাঁসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, 'বাই গদ্‌, হোয়াৎ ওয়ান্দারফুল রুইন্‌স্‌ দে উইল মেক্‌!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

* * *

কিন্তু এ সব কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ ভী থাকবে। যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি। সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসাবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি।

অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলাম শ্রী গাড্গিল মূর্তিটির মডল্ দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না।—যদি কোনো রস দেয় তবে সে বীভৎস—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে। কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ট করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণ ভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজদের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লণ্ডনে বসে মূর্তিটির ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টৈটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আল্পনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম, 'জয় হিন্দ।'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'আলাইকুম সালাম আজ তোমাদের ইদের পারব না ?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি ?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে "বকুল", হেথাকার নেটিভ ভাষাতে "মোলশী"।'*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী,—মোলশী বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালীর ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো ?

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে "প্রাণনাথ" বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, সে আবার কি ?'

'প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।'

'আরো বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক "চুকুমবুদাই" অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে বললে, "দাও তো হে, এক সের বাইগন।" দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক। "বেগুনে"র উচ্চারণ "ব্যাইগন" শুনে একটুখানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, "কি বললে হে জিনিষটার নাম ?" বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্কারা করার মানে ?— চতুর্দিকে আবার বিস্তর "ঘটি" দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, "বাইগন কইছি তো. বেশ কইছি হইছে কি" ?'

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে "প্রাণনাথ" ডাকলেই পারো। দাও, তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত ? ছ' পয়সা না সাত পয়সা।'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্ব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছে, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

আমি পরিবেশন করছি কেন ? এ গল্প জানে না কোন্ মর্কট ? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে ?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

* * *

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন. 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে ?'

খাইছে। আমি করজোড় বললুম, 'আপনিই মেহেরবাণী করুন।'

বললেন, "রেডুক্ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম" কাকে বলে জানো ?'

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডুয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন। জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে "রেডৎক্সিয়ো আড্ আবসুর্ডুম"।'

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও এ্যাড-এ্যাবসার্ডাম্।' একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন ? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি ?'

'সে কথা থাক। শোনো।'

আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম "প্রাণনাথ"। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।

এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে ? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দু'দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো সন্দ নেই।

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয় ? দুদল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

কিন্তু কার্যত হল কি ? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দুদল বেরিয়ে এলেন দুদিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি।'

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশী হ'ল বল তো।'

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম!'।

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যাণ্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদি সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরেজি বলেন ভাঙা-চাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যাণ্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, 'আহা, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘরদোর।' সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?'

সায়েব বললেন, 'মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে বাঘে ভর্তি, মধ্যিখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?'

এই খেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হল।

* * *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরি' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করেছিলেন যাতে উনবিংশ শতকের 'মুক্ত', 'কুসংস্কারবর্জিত', 'বৈজ্ঞানিক' মনও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধ-ধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্যন্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রে'র অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যাঁরা 'এহ বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনে বেরুলো। তারই দু'একখানা 'দ্য লুক্স' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে. এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরুতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানি নে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদেরচেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশী, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়লাপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছটে' ভর্তি হতে লাগল যে সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না!

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি যিনি, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মাচরণ তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইয়োরোপের বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরুতে লাগল, ইংরিজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় রুশ ভাষায়. কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়,

হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো সেগুলো পল ব্রান্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগাণ্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েণ্টালিস্ট্স্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে, কণ্টিনেণ্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানি নে, এ আন্দোলন খুব বেশী লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্থির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না? প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অন্নবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মম ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইভাবে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতুবী রইল।

* * *

ইয়োরোপের উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্ততল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্‌স্ যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই??

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল

তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল ;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লণ্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন ?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'নো টী !'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি ?'

'নো কফি !'

'কোকো ?'

'নো কোকো !'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা ?'

'নো সোডা !'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্কচ্‌—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার !

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজী 'ক্যারিইঙ কোল্‌ টু নিউ কাসলের' ফরাসী রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনি নি ; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা ?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু'দলই

চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে ?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন— লরেন্স সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সবাসিভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে ?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজর হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে ?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চন্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গটগট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা

দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা' —অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মাদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুকে পেঁছিনর পর তার নাম হয় হিল্সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লংকা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পুজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মরাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশী তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সব চেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বুই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়।

কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউণ্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কণ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ অতোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ, তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশী নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশীর ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল এ্যাণ্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ-বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীরা তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল। এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সব চেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই ব্রাহ্ম

মুহূর্তে।

তাবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রৌদ কফি ?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রৌদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স্‌ দি—সে কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না ; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেণ্ট নয় তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমাদিব্যি নেই। দুম্ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকী তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্ এক প্রদেশের—বঙ্গালা, বাঙালী—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা ?'

'হ্যাঁ, হাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগা, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে

খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাঁকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্‌স্‌টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—।' কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;— আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিক গোলাপী গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক, কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে

কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেটে।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে আপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি.কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে

ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উদাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেটফোঁকা পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন ? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস' কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই ?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন ?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই ?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস !'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে,

'কাকে লিখলে ?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি ?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় "ফামিনা" সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন ?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।'

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবণ্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী ?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সব চেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসিস, ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে

কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টাদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্ সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ ঃ এমন কি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে, হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের' উত্তর-পূব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্‌থ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইন্সিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার বউ কোন্ মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লণ্ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায়, দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম ; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাতো সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালে-ভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকাল বেলা বাড়ি ফিরবেন।

ধূপ-ছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পেঁছিব।

তিনদিন ধ'রে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাত্রে যে জহরের ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা! মহিলারা কে কি পরবেন তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুঝলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত, অর্ধপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, বয়সে চ্যাংড়া, চব্বিশ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর

সঙ্গে কথা কই নে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কোবিনে —বিবেচনা করুন খুদ কোবিনে, 'ডেকে' না, 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পলিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, 'ইয়েস, ইয়েস, উই, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুরাশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্ গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা, এই করে করে ফ্যান্সি বল্ 'রূপায়িত' হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্ ইণ্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছেন এক পাসী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা 'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'—কাঁচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এ সব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

'বারে' গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিয়েছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপী হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব-সংসার গোলাপী রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পোঁচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হয়ো না মাইরি, এই শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে, হেথা-হোথা, একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী বলা', কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল কত হিয়ায়,

কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।'

অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগরেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারে নি ; আমাকে পেয়ে খুশী হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমা-যামিনীতেও দেশে কখনো দেখি নি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙ্গার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে-গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহেমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসাঘরের একখানি জানালা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা॥

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স, এই ধরুন চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মুখ আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন্ দিশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনো ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মুখে ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস বললেও ভুল

বলা হয় না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা, ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিন চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এযাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনি নি। সমস্ত দিন লাউঞ্জের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখি নি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশী, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দণ্ড রসালাপ করাবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাই নে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশী জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্প্লেক্স' কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধেমত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ্।' তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন? সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সীর মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বদ্যি খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখ্খুনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দুনিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী।'

মহিলাটিও এই হুল্লোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শুধালেন, 'আপনি ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশী কথা কইতে ভালবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচ দিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ শহরে। তারপর গেল আট বছর লণ্ডনে।'

আমি শুধালুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন, 'না, লণ্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লণ্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি,

জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দুনিয়ার সর্বত্র। সেখানে ওঁর দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদ্বারা আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরান ইহুদিরা যে দু'চারজন লণ্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে "গ্রীন পীজ, কলি-ফ্লাওয়ার, টাপেন্স, থ্রাপেন্স-হে পেনি" বলতে পারি, ব্যস।'

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে, দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শুদ্ধ উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। লণ্ডন সাফসুৎরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বুড়ো গরিব মেশেদ? তবু যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় লণ্ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু যখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা বাপ-পিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্লাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি বয়স হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, জানি, কিন্তু যখন এ কথাও জানি যে, লণ্ডনেই মরতে হবে, তখন যেন বয়সের আর গাছ-পাথর থাকে না।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুঝলুম, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কি না, তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছেন। শেষটায় বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা মেশেদের পুরনো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নূতন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। লণ্ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্তরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন—এখন তিনি লণ্ডনের প্রেমে; বুড়ী মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশী সময় কাটাবার কোনো

প্রয়োজন নেই।'

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, 'বসুন'; তার পর শুধাতেন, 'কি খাবেন বলুন।' জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুরবাড়ির মত, কাজেই এস্থলে 'খাবার' বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, 'প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?'

অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লণ্ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয়।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন।'

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?'

আমি বললুম, 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে। আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।'

হেসে বললেন, 'তবে আপনার রসবোধ আছে! এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদের লোক পোলাও খায়?'

বললেন, 'হায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যাসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আপনাকে বলি নি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।'

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমি যে দিদিমা হতে চললুম।'

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করতেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, লণ্ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো। ইস্তেক জর্মনিতে পাস-করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।

বললেন, 'ও কথা বলবেন না, মশাই ; মেশেদে আমাদের যে বুড়ী ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরে নি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায় নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু'খানা খালি হাত দিয়ে —ডাক্তারদের যন্তরপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।'

উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দেবেই না কেন ? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লণ্ডন-প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন ? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে ; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত ?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লণ্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা ; মা যা মায়ের শহরও তা।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিন-জনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, 'বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে ?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম ? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল ; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো ?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদী পরিবারে ছিল।' ॥

কোন্‌-ভিনারের মা

বরোদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট্‌ কোন্‌-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্‌' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোট-পাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লন্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাবড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়-কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো,' মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্‌-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্ট্‌-গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন,—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসর জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকী জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্‌-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদী পুরুষ-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করাতে ইহুদীর শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়বার বাসনা আমার আছে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশে'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্‌ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর নসিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্‌-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা' ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ('ইংরেজিতে') জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে ; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল —আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি ; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্-ভিনার শুধালেন, 'আপনি কি বার্লিন যাবেন ?'

আমি বললুম, 'এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্, কলোন, হানোফার, বার্লিন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।'

কোন্ ভিনার বললেন, 'আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩এ। এদেশে আসি '৩৫এ। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি ; আমার বুড়ী মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারে নি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—'

আমি বমলুম, 'আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খানিকটা কিন্তু-কিন্তু করে কোন্-ভিনার শেষটায় বললেন, 'তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য—'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।'

কোন্-ভিনার বললেন, 'আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়ীকে জানিয়ে ? আমার বাবাও হার্টের রোগে মারা যান।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?'

পবননন্দনপদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পৌঁছই নি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পৌঁছলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

৩২এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো, ৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে ৩৮এ গিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামিটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ওদিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেম্‌প্লেট-গুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু'একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদী,—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদীদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বারো নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ক'তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু-তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে ইহুদীরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশী—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার

অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন ?'

এখানে ইহুদীরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই— কি মতলবে এসেছি কে জানে ?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বারো নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদীরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ী কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার ফালি ফালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাই নি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। আমি এখন কাঁদব কেন ? আমি কত খুশী। এর্নস্ট কি রকম আছে ? তার বউ ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব— দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুছছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কাল আবার আসতে পারবেন ? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ী নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম,

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই ; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।'

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্-ভিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন ; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ?

শুধালেন, 'এস্‌পেরেগাস্ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে ?'

আমি তো অবাক। এস্‌পেরেগাস্ মানুষে খায় পশ্চিম বাঙলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন ?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্‌পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্‌পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্‌পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশী তফাৎ। সেই এস্‌পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল!

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্‌পেরেগাস্ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্‌পেরেগাস্ খান—বেলা-অবেলায়।'

বুড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারি নে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু-কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহন্নত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্‌পেরে-গাস্ খান।'

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশে'র চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্য লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথ্যেবাদীও বটে।

এস্‌পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিল সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

সকেটে ঢুকিয়ে এস্‌পেরেগাস্‌ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্লীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানে-ওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারত না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশী করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্‌ করে দিয়েছেন। কোন্‌-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশী হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্‌!

হায় রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্‌-ভিনারের মায়ের এস্‌পেরেগাস্‌ রান্নার বর্ণনা বতরিবৎ বয়ান করি! অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্‌পেরেগাস্‌ রেঁধেছেন কোন্‌-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্‌-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কোন্‌-ভিনারের মা পই পই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোন শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছি নে। তাদেরও কোনো শোক করতে হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্‌-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * *

ছ'মাস পরে বুড়ী মারা যান। কোন্‌-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানি নে।

কোন্দণ্ড মুখহানা

(জীবনী)

দ্বিতীয়বার বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা সব কিছুরই তখন কমতি ঘটে, বাড়িতে থাকে শুধুমাত্র হুঁশিয়ারিটা, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারের উৎসাহের চোটে বউকে কুমার জীবনের দু'একটা রোমান্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়েট চেম্পিয়ান, এবারে আর সে পাঁচালি না, এবার ব্লাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড, কেবিনবয় সক্কলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাতিরযত্ন উশুল করে মামুলী টিপ দিয়েই মোকামে পৌঁছাব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে খানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শুনে জেলের কয়েদীর মত হন্তদন্ত হয়ে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ মন্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই!

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভরা মাথা গুঁজে ছুরি-কাটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট কোট, মানানসই শার্টকলার, শিষ্ট-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বন্ধ করে গোগ্রাসে তাঁর গল্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গল্প বলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্যেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজ্যে, শুক্ল, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল যাবার ঘণ্টা পড়েছে। এরি মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শুধু যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সক্কলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন্ দিশী নাম রে বাবা ! পরনে সুট্, মাথায় তুর্কীর টুপি ! গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধে-মেশানো ইংরিজি বলছে । মিশরের লোক ? উহুঁ ! সিংহলী ? কি জানি । মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী টুপি যখন রয়েছে ।

দু'খানা ফর্ক হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাসুল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি ।' বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাই নি, তার জন্যে যেন মাপ চাওয়ার মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাসুল্ পাশা । প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস । তারপর এসে জুটল ককেইন । সে যে কি অদ্ভুত কায়দায় মিশরে ঢুকতো, তার সন্ধান না পেয়ে সি. আই. ডি. যখন হার মানলো, তখন রাসুল্ পাশাই কায়দাটা বের করলেন । কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাকে না জিজ্ঞেস করে সি. আই. ডি. পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি । রাসুল্ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, "ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশী মিহিন, সস্তাও বটে । তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানির খেল রয়েছে । একটা টেবিলের পায়া ভাঙতেই ককেইন বেরিয়ে পড়ল ।" বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ । কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে-যাচ্ছে, তাতে যেন এক্সরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে ।'

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিয়ে নিপুণ হাতে দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন । ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা সার্জনের অপারেশন । এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান । খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশীর ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে । এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে । আমি বললুম, 'আপনি দেখছি মিশরের অনেক কথাই জানেন ।' তাঁর মুখে তখন মাছ । কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন । ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব ।'···বললেন, 'জানব না ? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মিশর ছাড়লেন কবে ?'

তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি ।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম । বললুম, 'বিলাত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা । কাইরোতেই থাকব ভাবছি ।'

প্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হুঁ ।'

আমি তো অবাক । এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্ততপক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সহৃদয় লোক নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় । এ ভদ্রলোকের কথাবার্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন, গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বর্ধনাটা অন্তত করবেন । তাই তাঁর দরদহীন 'হুঁ'-টার ভেজাকম্বল আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল । আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্পষ্ট বুঝতে

পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানি নে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনি আমায় মাপ করুন।' আমি বললুম, 'সে কি কথা, কি হয়েছে?' বললেন, 'আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু'চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি। আপনি আসবেন কিনা জানি নে; তবে স্ট্যাটিস্টিক্স যদি পাকাপাকি বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করি নে।'

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসলেন। বেশ একটু গরম সুরে বললেন, 'আশ্চর্য হই বার বার স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমন কি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারি নে।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, 'আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাই নি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন।

মুখহানা মুচকি হেসে বললেন, 'ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজি বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্‌টর্।'

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন? তবে আলেকজ্যান্‌ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা "মোহিনী টী", আমার চায়ের ব্যবসা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'মিশরের লোক কি চা খায়?'

বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?'

খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া

চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প। আমার ব্যবসায়ে। বলব সব ?'

আমি বললুম, 'ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয় ? আপনি ভাল করে সব কিছু বলুন।'

মুথহানা বললেন, 'তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যান্ড্রিয়া। তারপর তান্তা দামনহুর জগাজিগ করে করে শেষটায় কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গাঁধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-ধলায় তফাৎ করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে ? তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

'পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাস পাওয়ার সময় যা-কিছু টাকা-কড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশকিলে পড়লুম অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবশ্য আমার এ-সব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশী হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা বিদেশী ওঁদের টাকা আমি নেব কেন ? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খদ্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তত্ত্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

'তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে, বাধ্য হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারে গাঁধী, আমি পারি নে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু'পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টি-মেম্বারদের চাটা-আঁসটা ফ্রি খাওয়াই, তাইতেই তাঁরা খুশী। টাকা-কড়িও মাঝে-মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।'

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুথহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখনো কামাতে শুরু করেন নি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'সামান্য দু'পয়সা—।'

হেসে বললেন, 'ইক্সেক্ট্লি। বেশী হলে দিতুম না।'

আমি শুধালুম, 'আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল ?'

'বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়লা রোঁদে মার খেয়েই বুঝতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে

পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকবণ্ড লিপ্‌টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধুঁয়ো বেরোয়, তার হয়ে যায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিং থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্লেণ্ডিঙের জানি নে কিছুই চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারি নে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবারদাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সর্বপ্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কৃচ্ছ্রসাধনে তো মিশরের রাজকন্যে পাওয়া যেত।'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আরেকটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়রা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করি নে। যাক্ সেকথা। আমি দেশে থেকে হরেক রকম চা আনিয়ে ব্লেণ্ড করে ব্র্যাণ্ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম "মোহিনী টী", মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লজ্জা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লজ্জার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘড়েল-ব্যবসায়ী মায়া-দরদহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধাশ্যামলিল মরূদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লজ্জা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে' এরকম ধারা কি যেন খানিকটে বলে আস্তে আস্তে আপন কেবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে? আর হবেই না কেন? বাংলা দেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুযের মা' হতে পারে, কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কী?

* * *

আস্তে আস্তে মুখহানা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলুম। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখ হল একদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্‌টন আর ব্রুকবণ্ড। তারা তাঁর পাকা ধানে মই দিলে না বটে, কিন্তু ধানের বেশ খানি-কটা বড় ভাগ তুলে নিয়ে খেতে লাগল। মুখহানা বললেন, 'আমি হার মানি নি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাঁটে নেই। ভারতবর্ষের দু' একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তাঁরা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেস্ত ডোবাতে চান না।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দুশমনি নেই।

জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজ তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাটো সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ-কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শুল্ক নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বটা জানেন বলে হন্যে হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সস্তায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথমবারে আমিও গিয়েছিলুম—এমন সময় হেলেদুলে মুখহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আসুন, মিস্টার মুখহানা। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

মুখহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কানা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?'

তারপর ছোটালেন আরবী ভাষার তুবড়ী। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অট্টহাস্য, কখনও অপমানিত অভিমানের জলদ গর্জন, কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আর্তরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী, সর্বশেষে দু'চার পয়সা নিয়ে ছেলে-ছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটাপাঁচেক স্ন্যাপশট্ নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহদ্দ খুব। হুঃ! লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুখহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী— অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

"কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে।"

দরদস্তুর, কারবার-বেসাতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি।'

মুখহানা বললেন, 'আবার! মিশরের যে-কোনোও গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।'

আমি বললুম, 'খানিকটে নিশ্চই পড়তে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।' মুখহানা বললেন, 'তুর্কী টুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো

মুসলমান নই।' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দু ধর্মের কি-ই বা জানি, কি-ইবা মানি।'

তারপর বললেন, এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্য। আমি বললুম, 'এক-রত্তি জমির জন্য আর পয়সা নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।' ওদিকে মহীশুর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি নাকি 'আজ্ঞা প্রভোকাতর', কম্যুনাল রায়ট লাগাবার তালে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে। কী মুশ্‌কিল! এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্যে। আমাকে দেখেই শুধাল, 'আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?' আমি বললুম, 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সুট পরতে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হক্ বর্তালো না?' আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায় "লর্ড" পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সে দেশের পাঁচজনকে হিন্দীতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আরব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুখহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কইলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম আত্মজন। বুঝলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্যে। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয় নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদা গাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সাসিকদের তত্ত্বতাবাশ, পাঁচজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানী হলপ খেয়ে বলবে।

সুয়েজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করে খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরনো অলঙ্কার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই,

আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবেই।' বিয়াল্লিশটা স্যানাটরিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারি নি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষী-গিরি করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

তারপর একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে পৌঁছিলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সাঁতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গণ্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যাণ্ডিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোর ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম, 'মোহিনী টী'কে।

এ দশ মাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখি নি। স্থির করে-ছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালী যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—"বাঙালীর বাত নড়ে তো বাপ নড়ে"।

কাইরো স্টেশনে নেমে কিন্তু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দেয় তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওঁর গায়ে সুটটি পরা ছিল যেন সার্জেনের হাতে রবারের দস্তানা —এর গায়ে সুট ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষ্টু টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দেখি কপালের ঢিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝিঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিন ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না।

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশীর ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন সুদ্ধ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অদ্ভুত যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলের চাঁদের ঝিকিমিকি।

এঁর বয়স তো এখনও আটত্রিশ পেরোয় নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যাক্সি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলেন। কি জানি, হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কন্তারা-তুল-দিক্কা স্টেশন থেকে দূরে নয়। ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার কি হয়েছে বলুন।' বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কিছু না,

* ১৯৩৩-৩৪ এর কথা: এখন অবস্থা অন্য রকম।

একটু কাশি।' এই মুখহানা সেই মুখহানা। আমি চুপ করে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রস দ্বীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু চণ্ডালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মুখহানা গ্রীক বললেন অক্লেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে ভুল আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যাস, সুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাজে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা-কামরা নেই। ড্রইংরুমে টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা, ছুরিটা, কাঁটাটা এগিয়ে দিল। মোট খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুঝলাম রেঁধেছেনও তিনিই। চমৎকার পরিপাটী রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মুখহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুষ্যি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দুর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলে যাবার প্রস্তাব মুখহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের ঢিবির ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সূচ্যগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যেরকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে অতিথিকেও তেমনি রাত্রে কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহরাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাত্রের মত বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবর্তন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মুখহানা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা আছে।' আমি আরেকটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সব কথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বেশী কথা বলতে কষ্ট হয়।

'জাহাজে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শুতে দেবার মত আমাদের একখানা ফালতো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাপ্পা দিয়েছিলুম

আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুথহানা তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, 'না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরৎ-বাবুর এক উপন্যাসে—আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।' বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুছিয়ে নিলেন।

'সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয় নি, ওভার ড্রাফ্ট নিয়েছে, শেষটায় স্টকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে ওখানে কত ছোটোখাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাই নি। আমার নাম জাল করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কী করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়েরটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—' একটুখানি হেসে বললেন, 'ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।'

নিজে দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যাঁর মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। 'বহু দেশ ঘুরেছি' এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধো বাধো ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধ্য হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুথহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্ত্রীও জানতে পারেন নি?' বললেন, 'তিনি তখন সাইপ্রসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এ-সব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকীটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

'শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।' আমি বাধা দিলুম। মুথহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বুঝলুম, মুথহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মুথহানা শেষ কথা বললেন, 'আমি কিন্তু সব কিছু আবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানি নে।' একমাত্র জর্মন বৈজ্ঞানিকদের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুথহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি যুবরাজেরও প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু কাইরোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে দ্বিধা

নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনেছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুর্তির পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকাল বেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নমাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়ানেওয়ালা) আর মুয়াজ্জিন (আজান দেনেওয়ালা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দত্তের প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পোজিটর পড়ার মুয়াজ্জিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসি নি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুখহানা পরের চিন্তায় মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দুনিয়ার যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশীর ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপীড়া। এদের সকলেই দর্জি—এ দেশে আর্মি কনট্রাকটার-দের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কনট্রাকটাররা চলে যাওয়ার পর এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দর্জির হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুখহানা যদি ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুখহানা যদি মিশরে বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালো-বাজারে ইহুদীকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কেমিকাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে), এখন মুখহানা যদি কোনও মালজাহাজের কাপ্তেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্‌টারও এলেন। মুখহানা যদি রেজিমেণ্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন ?

দুপুর বেলা খাবার সময় মুখহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যে-রকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কর্তাদের মাঝখানের বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরী, ইংরেজ সর্বপ্রকার কর্তাব্যক্তির মধ্যিখানের অনাহারী লিয়েজোঁ অফিসার।

শরীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিন্দনীয় হলেও স্বাথ্যের পক্ষে সেটা ভালো, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুখহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ-আমি কি করব ? আমি যে এখানকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

সেক্রেটারি।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মেম্বার কারা ?'

'ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাবণ্ড।'

'আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না ?'

'সব টিপসইয়ের দল। কনসুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে ?'

'তাহলে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন না কেন ?'

'প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কন্‌সুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায় ? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেস্টিজ দেখানো চাই।'

'প্রেসিডেণ্ট কে ?'

'এক বুড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।'

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদুপদেশ দেয়া অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শুনেও শুনবে না।

মুখহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মুখহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে ?'

হেলেনা বললেন, 'খেটে খেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন। তারপর নূতন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন ক্ষিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নূতন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাঁকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন!'

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, 'জ্বর-টর হয়েছিল ?' বললেন, 'প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শুয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকান নি।'

আমি বললুম, 'এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

হেলেনা উঠে চলে গেলেন। আমি থামালুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চায়ের সময় আমি মুখহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি

যে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মুখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন :—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচারকর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই ॥

—সত্যেন দত্ত।

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মুথহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয়বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জল ফেললেন হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পই পই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্, ডাক্তারের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিত্ত কোন বাঙালী পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শুধু অফিসে ডেক-চেয়ারে শুয়ে থাকতেন। কতদিন মর্নিং-কলেজ থেকে ফেরার মুখে দেখেছি মুথহানা চলেছেন ক্লান্ত, শ্লথ গতিতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খদ্দেরের আফিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, ন'টা, দশটায়।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সব কিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেত্রাঘাতে। মুথহানা-পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে কারবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুক্ খুক্ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, 'পরান্নং দুর্লভং লোকে' কিন্তু সে পরান্ন যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বথা বর্জনীয়।

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা! মুথহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখি নি, হয়ত এরকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটে নি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার তিনি মুখহানার শরীর মুছে দিতেন, সে শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মুখহানার সঙ্গে এক খাটেই শুতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুনয়বিনয় করলুম, তখন তিনি বললেন, 'আমি কাছে শুয়ে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।' আমি বললুম, 'এ আপনার কল্পনা।' হেসে বললেন, 'ঐ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিয়ে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।' আমি চুপ করে গেলুম।

কত-না হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা জাফার কমলালেবু, কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করতেন টমাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, কোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজী রসম্, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মুখহানা বেশী কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত। তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধন্বন্তরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি, আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালীর মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখো মেমসাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত—এই অদ্ভুত জংলী লোকটার বিদ্ঘুটে চেহারা দেখে, আর অস্বস্তিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্যন্ত ফেলে না ; মেঘ জমে না, দরদের অশ্রুবর্ষণ বিদেশী বিরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মুখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকৃষ্ণ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রত্তি মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে, লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মুল্লুকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মধ্য-সাগরের মধ্যিখান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

ভুল বললুম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মুখের উপর। পুব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকাশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মুখও ছেয়ে ফেলল। দু'চোখের চতুর্দিকে যে কালো ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমুখ খরা মেঘ ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির গা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জ্জন্য ! এ রকম মেঘ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনি নি। কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মুখহানা হেলেনার মুখের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, তুমি লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?'

অর্জুন বললেন, 'না গুরুদেব, আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মুখহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে ধোঁকা লাগল, মুখহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কি না। বিশেষ করে যেদিন শুনলুম, তাঁর রেস্ত নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে মাল ছড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মুখহানা কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান। ওদিকে ব্রুকবণ্ড লিপ্‌টন অঢেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে বিনি পয়সায়, বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে সাজানো মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বুকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোম-ভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মুখহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে তোলাকে এগিয়ে দেয় এক কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

ত-তত্ত্বটা মুখহানা বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশগুল। আমি তো ব্যবসা জানি নে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সে-ই বেশী।

মুখহানার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরাশিখানা সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমাদের ফ্ল্যাট চড়তে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, ড্রইংরুম পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ধোঁকে, অথচ মুখহানাকে ভাঙতে হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত দুবার করে এই গৌরী-শঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মুখহানা যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কাই-রোতে নতুন বাড়ির সন্ধান নতুন কারবার গড়ে তোলার চেয়েও শক্ত। সেলামীর টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে নাকি মুখহানা কোনও এক ড্রেন থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মুখহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী ভুল আরবী শুনে মিট-মিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অন্ধি-সন্ধির সন্ধানে থাকে।

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মুখহানার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার অন্ত ছিল না। রান্নাঘরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ণ করে তার কান যেন গিয়ে সেঁটে আছে ফুটপাথের সঙ্গে (আমরা কেউ কিছু শুনতে পাই নি—হঠাৎ কাজ-

কর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খক্‌খক্‌ শুনতে পেত, তা সে-ই জানে। প্রতি তলায় সে চেয়ার পাতবে, মুখহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুখহানাকে পাঁচতলায় নিয়ে আসত। কেউ বাতলে দেয় নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুখহানাকে কখনো দেখি নি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা বলতেন, না অন্য কোনও কারণে জানি নে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলা-ফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন যাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়ে নি।

পয়লা ঘ্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোব্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুখহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাঁটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নূতন জোব্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুখহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সন্ধানে লেগে যাও।'

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লম্ফে ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এ-রকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রী করাতে। গিয়ে দেখি, মুখহানা কন্‌সুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সর্বপ্রকরের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন্‌ এক ভবঘুরের জন্য একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুঝিয়ে বলে, 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা কি করে জানব লোকটা ভারতীয়, আর ভারতীয় সপ্রমাণ না হলে আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুখহানা ততই ইমান-ইনসাফ্‌ দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দু'খানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও 'দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরো'র প্রতিভূ হিসাবে সদম্ভে সগর্বে দু'হাতে বুক চাপড়ান!

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেন নি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটায় রাজী হল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুখহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পান নি। আমি যখন বললুম, 'টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,' তখন তিনি হঠাৎ তেড়ে খেঁকখেঁকিয়ে বললেন, 'লোকটা হজে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুখহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার মেজাজটা একটু

তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমায় মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দুখানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

আমি কাইরো আসার পরও মুখহানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারপর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, যক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাঁড়াল যেন দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সমঝে চলতে হবে। রাজপুত্তুরের শালার জাত, বাবা, চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মুদিটা পর্যন্ত পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্তুরের শালা, বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়, আমি সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশররাণী গ্রীক-রমণী ক্লিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছি, জবাব এলেই খবর পাবে!'

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিন্ধী ভাষায় প্রবাদ আছে—সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক-মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ছুটলো সে ছবি দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাশ মিশরী)। সে ধরে বসলো ছবি দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মুখহানার মনটা যদি চাঙ্গা হয়। হেলেনা বায়োস্কোপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি 'কিউ' লম্বা হতে হতে প্যাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালা-বাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিৎকার। বাঙালী যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়। মুখহানা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ্য করি নি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন?'

আমি বললুম, 'না।'

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায় "হেই, ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল্ তো, আমি ওটা কিনব"?'

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মাতে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসা-মন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সে-ই হঠাৎ এক ফ্রাংকেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু দিয়ে নিষ্পেষিত করে বিন্দু-বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুথহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুথহানা ঠাস-ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলুম না, বললুম, 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলুম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন মুথহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কি-রকম আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, সে কথা বুঝিয়ে বলব। অন্তত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক—সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুথহানাকে ভুল না বুঝি। এ মুথহানা সে মুথহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধ্যসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলেছিলেন তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুথহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুথহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকান নি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে তিনি আমায় ফাঁকি দিতে পারেন। মুথহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন—"সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশী কামাবার উৎসাহ পাব।" আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেরে যাবে।'

তারপর বললেন, 'বলুন, আপনি মুখহানাকে ভুল বোঝেন নি ?'

আমি বললুম, 'না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুখহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশী সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।'

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানি নে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুখহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বুকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বলিও নি। পরদিন ছুটি ছিল। মুখহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কথা আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্থির করেছি, কারবার গুটিয়ে ফেলব।'

আমি আশ্চর্য হলুম, খুশীও হলুম, বললুম, 'সেই ভাল।' বললেন, 'আমি হার মানি নি ; গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড্ড কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে এক মাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।' তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো কখনও কুর্গে যান নি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সইতে পারি নে। আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দেয়।'

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলছেন না। সাহারায় এই বালু-ছাঁকা শুকনো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগুণতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিণ্ড ট্রি কাকে বলে ?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

'আমার বাড়ির সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না কচু ! হোয়াট রট্ !

আপন মনে মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বোকা ! এতদিন এ কথাটা ভাবি নি কেন বুঝতে পারি নে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলে নি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়ের হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেব তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া। ব্যস্ ! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা ! হোয়াট ননসেন্স !'

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, 'হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কর্ম নয় ! আর এ মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কী রে ?'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।' তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। মুখহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। আমি

জেলে নই তা বলতে। পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশী না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুখহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলায় উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

'বুঝলেন হের ডক্টর, আমার মা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন?'

ভাঁড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথোবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে না। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পথ্যি দিয়ে। কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বঝতে পারবেন ওর হাতে যাদু আছে। কিন্তু ওসব কিছুরই দরকার হবে না আমার। ঐযে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড়া কারে কয়!'

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরঞ্চ মুখহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুখহানা বললেন, 'আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলি নি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে খাওয়াবে। আমি অবশ্যি শিগ্গিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক'মাস বড্ড খেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে।'

আমি বললুম, 'ও'কে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন?'

মুখহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হুঁ, বড্ড কাঁদছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন মিস্টার মুখহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশী রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।'

বুনো শুয়োরের মত মুখহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, 'যান, যান, বেশী উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেন নি যে বুঝতে পারবেন হেলানা আমার কে?'

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্যি এসব ধমককে থোড়াই কেয়ার করে।

ফিরে এসে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব?'

'জী?'

'রাগ করলেন?'

'পাগলা না কি।'

বললেন, 'আমার মা'র কথা বলছিলুম না আপনাকে? অদ্ভুত মেয়ে।

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। কি দিয়ে যে আমায় মানুষ করলো, এখনও তার সন্ধান পাই নি। এই যে আমি কারবারে হার মানি নে, কন্সুলেটে ঘাবড়াই নে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাই নে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, লেখাপড়া শেখে নি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কক্খনো বলি নি।'

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, 'যদি কোনদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু বলবেন, 'আমি মুখহানাকে চিনি,' ব্যস্ আর দেখতে হবে না। বুড়ী আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

* * *

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুখহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনেছি। একই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরে নি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুখহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, নাইতে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শুধু-গায়ে চলাফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদায় নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দু মাস মুখহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। ধুঁকতে ধুঁকতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ি-মরি হয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে-ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাত্রে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুখহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুখহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনায় হিস্যায় ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

'হের ডক্টর!'

'আপনি আমাকে সব সময় "ডক্টর", "ডক্টর" করেন কেন?'

'রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখি নি। আমার বন্ধু "ডক্টর", সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলুম কি, আমার

'মা—না থাক্—'

আমি বললুম, 'আপনাকে বলতেই হবে।'

'আপনি শক্‌ট্ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানি নে। আমার মা ব্লাউজ-শেমিজ পরেন না, শুধু একখানা শাড়ি।'

আমি বললুম, 'আমার মাও গরমের দিনে ব্লাউজ শেমিজ পরেন না।'

'আঃ, বাঁচালেন।'

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুথহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান ত্রিশেক খাম দিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।'

দেখি লো,

C. D. Muthana
Virarajendrapeth
Marcara
South Coorg. India.

বললেন, 'হেলেনা শুধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছি।'

টাইপ করছি আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড় অমঙ্গল চিন্তা, পাপ চিন্তা—কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনকে তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুথহানা আমাকে ডেকে বললেন, 'ওমর বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?'

আমি বললুম, 'কার জন্য কিনছেন?'

'আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলেছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তর ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশীটা হবে!'

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুথহানা ভারি খুশী-মুখ। বার বার বললেন, 'শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।' হেলেনা—থাক সে কথা। ও-রকম অসহায়ের কান্না আমি জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুথহানাকে চিঠি লিখলুম। জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম, 'কোদণ্ডের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্য তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলুম। আপনার কথার

সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।' বহু ভেবে-চিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদণ্ড মুখহানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব-সভ্যতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কথাটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশী উঠবে না। যে সব বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-থেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে সুদ্ধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতি-শার্ট পরে—বেশীর ভাগ যে জামা-কাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে-নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শর্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শর্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালী, মেরুন-নীল রঙের মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। এক-রঙা জামা যা পড়েছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ যে সেটা পরার কোন অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন? আমাদের জেলেনীরা তো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রুপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না, রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে না-ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-থেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটামারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরী—সামান্য সীসের গুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলিপেরেকটার বদলে এরা সকাল সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশীর ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু'মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনা'র নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন প্রবঞ্চনা?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফকিকারের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতা'র এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়া-ঝাটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসীহাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চা-বাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলায় ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে আছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্সা-ওলা যাচ্ছিল। রিক্সা দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্সা টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্সা-ওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে—আর আমরা তিনজন বাঙালী গড়পড়তায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতারবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যাণ্ডে।

ফিনল্যাণ্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনাচেনা বলে মনে হয়। সে কথাটা বলতে আনিকি, একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালী দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোস্তের গাড়ি ফ্রিব্-গ্র্যাটিস-অ্যাণ্ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ত্রো, ভিল্‌নভ্ (রমা রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানা-প্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সূক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শুধালুম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসী কাউন্ট, ইতালিয়ান ডিউক সক্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ ইংরেজ, কোন্ ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে! যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্‌কেই পাকড়াও করতে হবে!'

আমি শুধালুম, 'ফিন্‌রা কি বেজায় ঢ্যাঙা হয়?'

বললেন, 'ছয় ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেঁপো ছোকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালে, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?'

আনিকি বললেন, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মন্ত্রো, লুৎসের্ন, ইন্টেরলা কন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * *

দু'এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেন্ট পাসিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, 'তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে। জাস্ট, এমনি, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে।'

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল ?'

'মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রাংক্ অর সোবার্' জাতীয় পাঁড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন ? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি ?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পুজা, ধন-দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা ?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না ?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখখুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে ; কোথায় যাবে বলো !' (যাঁদের ভ্রমণে শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যাণ্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু' মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী আয়লেণ্ড' বা আফ্রিকার এমন কোন দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা-নারকেল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবশ্য মালদ্বীপ সব চেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি ? এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পেঁছয় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু'দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপ-বাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যাণ্ড সই। সুইটজারল্যাণ্ডের মত আক্রা দেশ ইউরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সর্বদেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইটজারল্যাণ্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন পোলাওই খান (সিন্ধী প্রবাদে বলে, 'স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন ?'), স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ড্য

লুক্স কেবিনে কিম্বা প্রেশারাইজড্ প্লেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জিনীভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনি যোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, তার চুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা?'

এই হল সুইটজারল্যাণ্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেট ভরে খান নি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাৎলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনী আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি। রাঁধুনী বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের পারে এসে একখানা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা, কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প্স সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চুড়োর কাটা-কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলায় বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্গুন্ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্প্সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমকি। যেন কোন্ খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল যাদুর ছোঁয়া লেগে রুপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রূপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা জড়াতো না ?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্‌-পার-উস্‌-পার ফেটে যাবে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ ?

রববারে জিনীভার লোকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইস্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লেকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আণ্ডাময়
মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যাণ্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাকধিন আর ওয়াল্‌ট্‌সের ধা ধিন না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুঁড়িদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশভ্রমণের ষোল-আনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসাবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

'দীন যথা যায় দূর, তীর্থ দশরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে—'

কিংবা কালিদাসের বজ্রমণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা), মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলেন সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে ?

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পাড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নেই। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যাণ্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যাণ্ডউইচগুলো টেবিলের মধ্যিখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেঁচামেচি! 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়েছে,' ফ্রিডি লজ্জায় টমাটো হয়ে বলছে, 'না না, মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যাণ্ডউইচ ভালো হয় নি,' 'ক্লারার মা'র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' আর টীচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ, অত করে চ্যাচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?'

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিকনিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টীচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন'বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল, গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দু হাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে, 'গুটেন্ টাখ্ (সুপ্রভাত)!'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন্ টাখ্, মাইন জ্যুসযেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় না।'

'তবে বলুন তো, আপনি কি দিয়ে চুল কালো করেছেন। আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালোচুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, আমি চুলে রঙ মাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম আমার লোমও কালো। বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু'টাকা জোর ন'সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্রা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা করকরে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা, পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পদ্মার-কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপী মেখে নিয়েছে, দূরের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বর-যাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যেবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো তো, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; অবহেলা অবিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরুব্বীরা ছেলেবেলাই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙাল ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়) ঠিকই দিয়েছে ; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড ?'

ব্রাহ্মণ ভারী খুশী। আমার পাতা বিছানাতে পরম পরিতৃপ্তিভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু অ—অ—অ, অ--বাবু, নারান্‌জোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্‌খান টিকস্ দিবাইন নি ?'

বাবু বললেন, 'ছ আনা।'

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না ?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটু-খানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বললেন, 'দে ব্যাটা দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মুলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্ ?'

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যাণ্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি'। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান ?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুর বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অকেস্ট্রা

বেজে উঠল ঃ

'গোলাপবাগানে, সান্‌স্‌সির গোলাপবাগানে—'

কি হয়েছিল ?

'সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না।'

ট্রেনে বসে আছেন ; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি ; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশবিভূঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আঁকুবাঁকু তার বুকের উপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম 'ব্যাপার কি ?'

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তাঁর হোটেল খুঁজে পেলুম সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' লঙ্কা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফন্দিফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্ আর কি—সে কথা 'দেশে'র পাঠককে হাইজাম্প-লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের

প্রাগে আসার কি প্রয়োজন ? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির 'রিন্ডারপেস্ট' কিংবা ভারত বিদেশে ক'শ' মণ গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পাণ্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পেঁছিতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখে নি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরে নি কেন ? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শার্লক হোম্সেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে খানা খেতে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রাগে তামিল ব্রাহ্মণ' যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি সুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ !'

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।'

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কাতে'' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুদ আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, 'কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না কি ?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে ?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—বিস্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আসতে আস্তে খুলে দেয় ? আমরা আহারাদির পর বেলকনিতে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্লাটের

আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সংকীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয়; সে-ই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপে এসেছে কি করতে? কি যে বলব, ভেবে পাই নে।'

এ তো তিনি আমাকে বলেছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম, তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তার চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়েই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ.-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক—জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয় নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয় নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ট্রেনে পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলুম, তাদের শকটা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হৈ-হৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তু-ভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুকনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু

আমার 'মর্ডান' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেণু-গোপলা, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর!"

'চাকরির ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারি নি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফোটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকাল বেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরো। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারি নে। আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পান নি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাংকার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে— সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানি নে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুঁশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে নই আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অর্কেস্ট্রা গানের পর গান বজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌ট্‌স্‌, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক—, বড় বড় চেক কাটা কোট-পাতলুন-পরা মার্কিন (আমাদের মারোয়াড়ী ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ করেন) নিখুঁৎ, নিপুণ, লিপস্টিক-রুজ-মাখা তন্বঙ্গী ফরাসিনী, গাদা-গোদা হাব্দা-হোব্দা জর্মন আর ডাচ্‌, গায়ে কালো নেট্‌ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানী রমণী, আপন হাম্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচু-নীচুর-টক্করহীন হকির বাঘিনী, টেনিস--পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।

এই হয়তেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি ?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজার-ল্যান্ডে এসেছে ফুর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে। তার কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় মদ খেত কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায় নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাও' করে বললে, 'আমার "বাজেল সংবাদে"র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারী রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই ?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভান করতে হয়। তাই করল। ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিস্সু নূতন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না ; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ; বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দু'টি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

'ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা!'

এই হল প্রধান সরকারী পন্থা, আলাপ-পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে। ছেলেটার নাম পিটু। পিটু বলবে, 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি ; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দি বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা ?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক'রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে ? ব্রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে কক্‌টেল্ বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে। তার উপরে আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়— অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পুব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'। সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারি নে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুল্লুকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে ; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখি নি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলেবেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন ?

পিটকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি ? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি আলাদা

যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য'—তাই তারা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয় নি।

'আরেকটা কারণ বোধ হয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে—মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তন করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো-মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গাঁধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গাঁধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গাঁধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাঁধী।'

ট্রুডে বললে, 'টেগোরের নাম করলে না?'

'পিট্ বললে, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাঁধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?'

গ্রেটে বললে, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুন্ন হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট্ বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ডাঙর দেবতা?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। তবে কি না তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেণ্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ডাঙর হলেন কি করে?'

এখানেই আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', আরো চাই'য়ের দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগ্রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন এ-ক'টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্য রুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাথা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা
গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে॥

* * *

এ দৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হেলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের সার্শীতে। সার্শীগুলো লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বুঝি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আগুনের জিভের মত লালের আঁচ উঠেছে, আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দূর পাহাড়ের চূড়োয় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউ দাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে বসা মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শুয়ে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই লাল

রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থুল কাণ্ড; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘেমেঘে, আকাশে-আকাশে পাহাড়পর্বতে, ঘরবাড়িতে এমন কি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে যাওয়ার ফট্-ফাট্ দুন্দড়াম্ শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড!

এ আগুনের কি জ্বালা নেই, না, এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপী পাপড়ির লোধ্র-রেণু, না জানি কত শত জ্বালা আবির-গুলাল এরকম অকৃপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুরীকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এই আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয়; এ তো সতীদাহের বহ্নিকুণ্ড।

গ্রেটে আর ট্রুডের ব্লণ্ড্, চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবির তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার সার্শী থেকে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দেখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আঙ্গিনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যাণ্ডেও নিত্য নিত্য ঘটে না। জাহাজের ব্যাণ্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিস্যেদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ' সৃষ্টি করে তুলেছে।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয়?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয়; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্চকে ঝক্ঝকে জানলার সার্শী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোনা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্যটক-দেরই লেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শুধু ফুটে উঠেছে অন্ধকার ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগুণতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত—একে অন্যকে অন্ধকারের এপার ওপার থেকে সাঁঝের পিদিম দেখাবার জন্য।

"মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধারার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যাথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে॥"

পিটু বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, আমি একখানি ছবি দেখেছি, তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চরৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিটুকে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?'

পিটু তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পেতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দর!) এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিটু বললে, 'আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

'আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়েডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমার বুকের রক্ত দুম্ করে জমে গেল ; আমার হার্ট'টা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না ; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলুম মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকী দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর? কলেজ ডান্সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও?'

পিট্ বলল, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

> 'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
> দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো ?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায়?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত!'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তার পর?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না ; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর ?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, "কিসের ভয় ?" আমি বললুম, "আপনি বড় বেশী সুন্দর।" তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আস্ত এ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা !'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্মে মজনুন দীদ !" লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে, বলে পিট্, গ্রেটে, হ্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম ; এই যে ইয়োরোপীরা প্রাণ খুলে ফূর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন ? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড্ড সিরিয়স, সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীষ্টের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পালা পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে—সেখানে হদিস মেলে না আমাদের সাধারণ পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কি ধরনে করত। শুধু 'মৃৎশকটিকা' আর 'মালতীমাধবে' সাধারণ লোকের সবিস্তর বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। 'মৃৎশকটিকা'য় রান্নাঘরের

যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের যে-কোনো রেস্তরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবে'র নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট্ সাহেবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন—বাবুরা তো কিছু মাত্র কম ঢলাঢলি করেন নি। তবে কি এই বিংশ শতকে এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পয়সা উড়োয় তার অর্ধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যাণ্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশী যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু সন্ধান পায় না। আমার মনে হয়, স্টীমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশী হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশী। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো মনে পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙীন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আন্দেশা করতেন কিন্তু যাক্, এ বাবতে 'রূপদর্শী' আমার চেয়ে ঢের বেশী ওকীব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নূতন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনি নে। আলাপচারিটা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি শুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অর্থাৎ 'বাবাজী বামুন, কায়েত, না বদ্যি?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

ইংরেজ শুনেছি হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাই নে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি খেঁকিয়ে উঠে তাকে স্নাবও করি নে। কিন্তু ফরাসী জর্মন সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশী মিশুকে। কাফে বা মদের দোকানে

তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নূতন লোক নিয়ে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে আড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জর্মন, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড় করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে তারা যায় ফুর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

ময়ূরকণ্ঠী

উৎসর্গ

মমাগ্রজ সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা আলী সাহেবকে—

নিবেদন

'পঞ্চতন্ত্র' বাঙালী পাঠকের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করাতে আমার জানা-আজানা পাঠকের কেউ কেউ ঐ-জাতীয় আরেকখানি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় শিষ্য ও সখা দিল্লীবাসী শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পুরনো লেখা থেকে অশেষ পরিশ্রম করে আপন রুচি-অনুযায়ী এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' ও 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল কোনো কোনো লেখা 'দেশে-বিদেশে'র চেয়েও পুরনো।

গজনী সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনী একাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিখে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বর্ণনা দেবার সময় তিনি বলেন যে, ঐ সব ধর্মের মহাজনগণ আপন আপন ধর্মের যে ধারণা হৃদয়মনে পোষণ করেছেন তিনি সে-গুলোর বর্ণনা করেছেন মাত্র—কোনো মতের সমর্থন কিংবা খণ্ডন তিনি করতে চান নি। নানা ধর্ম বর্ণনার সময় আমি প্রাতঃস্মরণীয় অল-বীরুনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

'বাঙালী' বলতে আমি উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেরও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ বাঙলাভাষী জনকেই বুঝি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলে ধরার বাজারে কিছু বলা যায় না—গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক—কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা-'বসুমতীর' কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালীর গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের 'অটামে'র ছবি তো মুছে গেল না। কীটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "You do not paint a lily"—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদু-মন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরিজী কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজী কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মর্মন্তুদ হয় যে, শ্যামলী স্থূলাঙ্গী জাগ্রতা গৌড়জার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা

সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝংকার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কীটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়াডস্‌ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালী তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম—তখন বসন্ত ঋতু। কীটসের 'হৈমন্তী'র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকী। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিতী হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে 'নর্থশর' বর্ণনা টায়-টায় মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সন্ধান পেলুম না। কীটসের সুন্দরীকে বার বার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে-পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে ম্লান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, 'তুলসীর মূলে' যে 'সুবর্ণ দেউটি' দশদিক উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদস্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্লানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন—জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের যে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন 'ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী' বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জার্মানির 'গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,—একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন—ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।

আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল-কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ নীরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম—জানি নে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণীজ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :—

আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটি ঢেলারে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলারে।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কি রকম হল?'

আমি কোনো উত্তর দিই নি।

শহরে উজির-নাজীর-কোটালরা গুরুদেবকে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'সে কি কথা, দেখা করে যান।'

আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, 'তাহলে আপনি গিয়ে বলুন।'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, 'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।'

গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবার্তা হল। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, 'অমিয়কে ডেকে দে তো।'

চক্রবর্তী এলেন। গুরুদেব বললেন, 'অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চীৎকার করে শুধালেন, 'গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?'

তখন সোক্রাতেস বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুর্গীটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সব দিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে॥

নন্দলালের দেওয়াল-ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ-রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।
গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী –
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলংকারের জাল ;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলংকার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহংকার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে ॥*

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র।

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পূব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতেরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

* * *

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোঙ্গ পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্ট্ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্স্ কোট'—সিক্স্-সিলিণ্ডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কালো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরাকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি! জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দোকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেমসায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্‌জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিও-প্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্‌জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্তে-রাঙা ব্যাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্যাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী-র‍্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুটিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটু-খানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কন্‌স্ট্রাস্‌ট্‌ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্‌ট্রাস্‌ট্‌-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর

এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখীরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ'জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাক্করোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আণ্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোব ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মুলোর আলপনা, গরম-মশলার কাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।

কনট্রাস্ট্, কনট্রাস্ট্, সবই কনট্রাস্ট্।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে !!

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

এর পর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকী তোড়ী' অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই 'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।' কালিদাসও বলেছেন,—সংস্কৃতটা মনে নেই—'বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ'ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি।

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন ; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে যাচ্ছেন ? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শীরনী বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও. ঐখানেই। সেখানে থেকে গেলুম বেৎলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস-সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড-বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধ ঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরা জীর্ণ আস্তাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কর্পূর। সব কিছু ভেঙে চুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে-খচা আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রস-সৃষ্টি সেণ্ট সোফিয়া, সেণ্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্ ? কেল লাঁগ ? বেলশে শপ্রাখে ? লিসান এ ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'দস্ পিয়াস্তর।' অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও॥

'দস্' ছাড়া অন্য কোন হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি

কম ? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয় ?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরীব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে—আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা ?'

শুধু যে চোরা ই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রীক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পেঁছিতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশ-ভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অস্মো না-ছোড়-বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু ; এত পয়সা খর্চা করে পেঁছিলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর ?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদুর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও 'কমুনিটি আছে।'

বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরে জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে ?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।'

খ্যাস-খ্যাস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে—'

আমি বললুল, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে

গিয়ে বলতে পারব তো ?'

তখন হার মানল। আমরা বহু লংকা জয় করেছি !!

গীতা-রহস্য

গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম-সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পদপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যে রকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয় নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্ব-মার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা ; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়—একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রথম শ্রেণীর টীকা। 'গীতা রহস্যে' লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। উনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজী এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মাণ্ডালে জেলে বসে মারাঠী ভাষায় লেখেন।

"অনুবাদ সাহিত্য" প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য

অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছেন। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

'লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত 'গীতা-রহস্য' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,— অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।'

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই ঃ—

'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠী শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন— রাঁচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠী শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠী শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।'

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, 'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল' বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখী অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অতভূপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্য-

বিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চমত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেন নি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহত হয়ে।

কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালী যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত 'গীতা-রহস্যে'র ইংরেজী অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাঠী পড়ে মহারাষ্ট্রবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালীও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা—এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙালী প্রকাশক যে পুনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :—

All rights reserved by
Messrs, R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City.*

বন

পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চললেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনে'র উচ্চারণ 'ঘরে'র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ'-কারটি 'ও'-কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন, উচ্চারিত হয় মোন, বোন,—ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘরের অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি

* সম্প্রতি খবর এসেছে, বিশ্বভারতীতে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি একলক্ষে পেঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে কঁকিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনে হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকে উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাটবিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরাজীতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে

বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ্ রুবেনসের শরীর ঈষৎ ইহুদী রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।*

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বার্গেণ্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি-ভূরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেন:

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?'

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো॥

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্ব-সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

* হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে —বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মত বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি-হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পলায়নম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো ; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছে থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সন্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা পুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফও সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি ॥

বর্বর জর্মন

ন্যূরনবের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলে যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশী হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহাই সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজী কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির—জর্মন বর্বর, 'বশ', 'হান'।

পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTAGEN / VON / REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ 'বাঙালী কথক'। (Erzaehler ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) 'আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনূদিত।'

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী

বাঁশি বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মুন্‌ড্‌শেফার।

কেতাবখানা যতত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে! 'বুশারফ্রয়েন্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন্ ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

গেল পাঁচ বছরের হিসেব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফিল্ক্লাসে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভারা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার। জর্মনরা বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

'সংকলনটি আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে এক রকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্পে কখনও বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম

শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।"

'ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যোটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

'সংকলনটি সুখে-দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই এক রকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

'বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সব চেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।[১] লেখাগুলো সহজেই দুভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

'সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সংকলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ,—হের দ. প. রায়চৌধুরী, ডি. ফিল. (গ্যোটিঙেন); ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী; য. চ. হুই, এম. এস-সি; য. ভ. বসু, ডি. ফিল, (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারীঙ ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য।[২] সুরসিক, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার[৩] এম. এ. বি. এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সংকলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।'

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য

১। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২। D. P. Roy Chowdhury; A Bhadhuri; J. C. Huii; J. Bose; S. C. Bhattacharya.

৩। ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত।

পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য যে অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কানট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তাঁরাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছ্‌পা হন নি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ংকর সচেতন নয়। ভাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।

পাঠকের সব চেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার কার লেখা ভাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি :—

১। আমার দেশ (কবিতা) : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়[৪]
(Schridvidschendralal Raj)

২। সন্ন্যাস : শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিল্বদল)

৩। অঙ্কিত; গোলাপ; চোর; কুসুম; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)

৪। দেবতার ক্রোধ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)

৫। পদ্মফুল; জন্ম মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)

৬। একাকী; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)

৭। বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)

৮। গলি; পরীর পরিচয়; নূতন পুতুল; ছবি; সুয়োরানীর সাধ; সমাপ্তি; সমাধান; লক্ষ্যের দিকে; সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়; পায়ে চলার পথ; কণ্ঠস্বর; প্রথম শোক; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আঁধারে আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। পাষাণ হৃদয় : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১২-২০এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদেরই

৪। জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার "শ্রী" ব্যবহার করেছেন। বাংলা "শ" বুঝাতে হলে জর্মানে sch (ইংরাজীতে Schedule এর sch), 'জ' বুঝাতে হলে 'dsch', চ বুঝাতে হলে 'tsch', 'য়' বুঝাতে হলে 'J' ব্যবহার করা হয়েছে।

যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকা-টিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জর্মন-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B A., বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজী, উড়িয়া বামুন।

সবগুলোর মানে, সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোটা-তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B. A, উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M. A, যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তস্থলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন্ সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন্ দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্বর নয় তো কি !!

ফরাসী—জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌণ্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক রকম সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিকাল যাইতে না যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ' অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য'।

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুর্ৎসে আইনফ্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলেফান্টেন', অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বাণ্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ভি এলেফান্ট'? 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ'? অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এই সব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগার এ্যান্ড বেটার এলেফেন্টস —হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ 'আরো ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী

হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে, কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যে পেঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কি খান, কি পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কান্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন?'

'কিন্তু হাঁ,' বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীষ্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না; আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই॥

'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—'

সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও

খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে-ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছ্বসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনী ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিসেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি, পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না! এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্তনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না, —মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল।

তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দী-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই নি। আমি শুধু বলতে চাই, সরোজিনীর কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর গালগল্প, তাঁর রাগ, তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি, তাঁর আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনোচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী, বাক্‌নিপুণা সরোজিনী—এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপেই তাঁর কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী?

স্বয়ংবর চক্র

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে আর্থাৎ নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবার কর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারাণ্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সচ্ছল ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত ; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম ট্রেন, চালু রাখিবার। জর্মনীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশীর ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনীতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরাজ ফরাসী স্থির করিয়াছে জর্মনীকে কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে ; জর্মনীর পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল! মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা হৃতসর্বস্ব ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। পত্নীর উপর্জেনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবন যাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না ; বিদেশে না, এদেশেও না। ইংলণ্ডে তো আরো বিপদ। বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত— স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন। (রেমার্কের 'ডের বেকৎস্যুক্'—দ্রষ্টব্য)।

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, 'মেয়েকে বর দিব,—ভালোই হউক আর মন্দই হউক—এ গ্যারাণ্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল. পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও ; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও নাও করিতে পারে তবু তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লইবে।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২-তে যে সব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ, বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই 'উচ্চশিক্ষাকে' ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না

লইয়াই—ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল—তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত—তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন্ দুঃখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাস করা মেয়ে আস্কারা পাইয়াছে বেশী। যে চাকুরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকুরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই—তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে—স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ম্বর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনই বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোন এক বরুণ মন্ত্রেই—ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্রই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ-সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ-পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিক' জাতির জন্ম হইল—ইহাদেরই নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল (মাউরার জর্মনী পুটস দ ক্লক ব্যাক' দ্রষ্টব্য)।

তখন পুরুষ বলিল, 'স্ত্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছু তখন 50।50। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙালী দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম—অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনীর স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে

সক্ষম হন নাই ? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্রা করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহর-গুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না ; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত। হিটলার কি কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে !!

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসীর প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়ে পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবন-বিখ্যাত ফরাসীস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্‌কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে !

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে ? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও ? আমজদীয়ার 'জঙ্গলী'ও তাই তোমার শেফ্‌কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে

স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,—ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশীজন সূপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয় ?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই ?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন ? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন ? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অনুপানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া ; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি ? সে কি কথা ?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐ দিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিস ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি ; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ

চাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় : হ্যাঁ আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালী খ্রীষ্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা—ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বাস্তু গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসী হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালী হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'বিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় : সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব : তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানি না সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পঙ্কে নিমগ্ন—ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব : এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India-গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।

পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন ; সেই সব পণ্ডিতের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রী নানা উপাধির লাঞ্ছন অঙ্কিত থাকিবে ; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পৌঁছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওল্ড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ' ; আমাদের যুক্তি-তর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলি এযুগে বরবাদ রদ্দি জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মুলো খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মুলোর গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মুলো' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 'মুলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—নদীর মুল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেন।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমা। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পীঠ বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজন নিন্দিত একটি 'চলতি' ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। সে যাহাই হোক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।

তীর্থে পুণ্যসঞ্চয় হইত কিনা সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সংকীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রতি বৎসর অকৃপণ-ভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ ?'

বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালী গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, 'ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।'

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, 'কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?'

নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালীছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম. এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?

এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এস্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারী ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, "কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?" 'হোমে'র অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইটন্ হ্যারোর ক্রীড়াভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, "হেয়ং দুঃখমনাগতম্'। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনীতে আছে, সুইটজারল্যাণ্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, বৎসর দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের 'টার্ম' স্বদেশে গোনা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিনকালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হয়ত উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে—দক্ষিণায়ন কীল অথবা হমবুর্গে, তার পরের বৎসর ম্যুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুরী ক্যোনিগসবের্গে। শুধু তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ, স্মরণ, আছে, শান্তি-নিকেতনের নন-কলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করা একটি গুজরাতী ছেলের বাসনা হয় এম. এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্বাবিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলিকাতার নন্‌কলেজেট। কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন্‌-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতী কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা!

কোন গুণ নেই তার—

বেহারীভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালী বিচলিত হয়েছেন। বাঙালীর প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালীরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয় সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দী-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালী-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বংলা ভাষা তথা বাঙালী বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে আমারা তাদের অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমারই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে 'সপ্তকোটি কণ্ঠে' উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে

অনাদৃতে, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙালীরা যে বাঙালীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালী যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজী, রণছোড়জী, (আসলে ঋণ ছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করিতে সাহায্য করেন) বা অম্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে—কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গড্ডালিকার তাঁবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালীই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে—এমন কি বাঙালী যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়জী, মহারাষ্ট্রে অম্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালীর পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তী এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালী), তাই সেখানকার চিৎপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু-সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন! এই মাছ খওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বঙালী সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ—কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও 'হস্তিনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্' উপদেশটি অবাঙালীই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন—

ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বিরাগ-ভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে বাঙালী ভারত-ব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমার পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত

কায়দায় পরীক্ষা আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দী-গুজরাতী-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দী বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনিপরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মণ লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দী, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালী তখন সেই ধ্বনিপরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালী পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে, তাই করল—ইংরেজ, ফরাসী অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্রীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori-কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দী গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন !) কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালীরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' করে তার উপর 'অত্যাচার' করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দী, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয় আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে 'মেজদিদি', 'বিন্দু', 'জ্যাঠাইমা' চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?' উত্তরে বললেন, 'শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞাজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা

খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজী ফরাসী জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান ; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমক-হারামির অন্ত থাকবে না।

* * *

অবাঙালীরা যখন বাঙালীর প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালীরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই— তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজীতে তাকে এত 'বুসট' করো যে অবাঙালী পর্যন্ত সেই প্রোপাগাণ্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বাচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালীকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনাবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালী বেচারী পড়েছে মাত্র গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজী যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়। ইয়েট্‌স্‌ সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় ঃ—রবীন্দ্রনাথের ইংরিজীতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজীভাষী ইয়েট্‌স্‌ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালী অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজী জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালী যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে ?

সাধারণ বাঙালী যখন অবাঙালীর এই 'নীচ' আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালী রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক টিটেমি করে বাঙালীর নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালী আমাদের অন্যান্য

মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করে না।

আমি বাঙালী কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালীর ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালী জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালীকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লী সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আমরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি—বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরী করে দিয়েছেন—তারি ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রীস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসী বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালী এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্য-ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরিজী তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালীর চেয়ে ভালো ইংরিজী শিখলেন বটে—যদিও সে ইংরিজী সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না—কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের

লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি—তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়—কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে, বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তামিল অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায় নি—আমার মনে হয় এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়ে নি কে জানে। আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা

অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকভাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তার খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি, কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি যে সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা—হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তার কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরী হয়—বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ কখনো একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর

দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ সে কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃংখলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়ঃ এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার অনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে ?

আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি ; এর গলদ,ওর ত্রুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক ঝাল দিয়ে খুশী করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মাচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন ? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না !!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড় বেশী আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্সত্যাগ করার পূর্বে প্রাণ ভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫ এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত 'পরিপক্ক' হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে ?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নুহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি ; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ শাহ'।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে ? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর-আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু

প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারীদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারীদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্ত পাণ্ডরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খানরূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সর্ব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরাণের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব' রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলীকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি

অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎ জোড়া—শাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্যে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে ? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয় ?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতুক শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশী। তবে ?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি ; পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে ?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজস্টি ? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না ?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগত—আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি ? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, বৈয়া-

করণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছু মিলিয়ে তাঁর অখণ্ডরূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালী ?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে 'হংসবলাকা'র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা মহুয়া'তে পেঁৗছে বঁধুকে 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর 'রোগশয্যায়' কবিকে সঙ্গ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্যকবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি—কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপন আপন যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদ্‌গ্রীব নয়।

এ-কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতি রূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন, এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি কি লিখতে পারতেন ? রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক' সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর ?

অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।

(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্রবন্ধলেখকের প্রতি) অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :

আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান ॥

শুধু কদম ফুল। প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু, মানুষের মত উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,—ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,—ক্যাননাইজ্‌ড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।

অথচ আজকের দিনে এ-কথাও সত্য সে অল্প বাঙালীই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তবে কি আমারা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাই নি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙলী যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালীর পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালীর পক্ষে, বিশেষতঃ সাহেবের পক্ষে—তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন —সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনীতে রাজাধিরাজের সম্ধান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মান যান ১৯৩০ সালে। মারবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিম্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই।

সেদিন বিকেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম—গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশানালিজম! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে ইংরিজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদ্যুৎশিখার মত ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য।

কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সব চেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলি জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে 'লীডার' বলা হয় এবং শুধু লীডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লণ্ডন যায়। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজন পন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো গান বা 'লীডার' জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন নি—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে রকম হয়েছে।

বাঙালীকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হ'লই না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন কণ্ঠে গীত হ'ল না।

কাজেই 'সাত দিনের ভানুমতি' আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ,

'চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।'॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বাস্তুবাড়ি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমারা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে।

হটেন্‌টট্‌দের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজন রূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়াতে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহনমন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমারা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যালোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্প-

কলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টি বিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে-স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনে'র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয় নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজী এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রীষ্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রীষ্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিমে ও বাঙালী মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয় 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারি নি। শংকরাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন: রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগীরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চারদিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পোঁছয় নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায় হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?"

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।[১]

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকো[২], তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষীগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।"

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়ো-

---

১ শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিতে, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।
২ Calligrapher=সুদর্শন লিপিকর।

কোয়ানের কবিতা থেকে 'পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেন নি। তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি—আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালী ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমন কি রিয়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তাঁদের কাছে তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলো করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে ফূর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রান্তে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজন-সুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং' জগতের প্রবহমাণ ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শ-কাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন নি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন নি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুক্ত সোমা গায়েফু কর্তৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক গায়ক ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পেঁছিতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকোয়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হল তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পান নি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারে নি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেন নি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন পক্ষের বিরুদ্ধে

হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেন নি।

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক-বয়সেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাই নি, আমি না দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেন নি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়:—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো'[১] দ্বীপ পানে

১ রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োক্বোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজন-সুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা[১] তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছে থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত-মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জেব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, "প্রিয়, তুমি এ কি করেছ!

১ 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীয়া।

তোমার গায়ে এ বেশ কেন ?"

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে ?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জয়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা-রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল ; এক দিকে ঋজু শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধান-কল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তাঁর সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সন্ন্যাস নেয় না ? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ? তাই বা কি করে হয় ? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন ঃ

মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত ! (—সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালী জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'—অত্যন্ত

সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলী কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখনো তিনি শোনেন নি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন ?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তিরও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তোয় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তোয় মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানালার সামনেই বসল কেন ? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন ?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ' (১, ২৯)। অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেন নি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনো অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল—আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভ্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসঙ্ঘে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

ফিশার বলেন, 'সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তর্পণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েন নি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, তিনি অত্যাধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন্ সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পান নি। মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি, তিনি, শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পান নি, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত

রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায় ? দাক্ষিণাত্যের আলংকারিকেরা তাই শংকরাবরণম্‌কে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চ স্থান দিতে সম্মত হন না। তাঁদের বক্তব্য সন্ন্যাসীর কোন অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শংকরাবরণম্‌ বা সন্ন্যাসী রাগে রচিত হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

খ্রীষ্ট বলেছেন, " The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head." অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্য নবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।

এ কি শ্রমণের রাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা !

ফিশার বলেন, 'মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।'

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেন নি; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া 'ক্ষণেকের খেদ' নয়, চিত্তাকাশে 'উড়ে-যাওয়া আবছায়া' নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে-সেতু আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পেঁছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন,

নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধ হয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাসক্তি থেকে প্রবলতর ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষকালে যখন আপন বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে-চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সে-চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহ-সংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যেগৃহ তার কাছে মধুময় বলে মনে হয়েছিল ('নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূরে হতে মনোলোভা') তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় 'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রণিপাত' বলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

বৌদ্ধ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেন নি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে এসে পড়ে; কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানী হাকু পদ্ধতিতে রচিত :—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি ;
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি !

রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, 'হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।'

বোধ হয়, এই সময়কারই লেখা আরেকটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে :—

এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্রভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বাঁচা হয়ে ওঠে মধুময়।
কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারি দিকে—রিপুর ঝঞ্ঝা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বার রণ। তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুক্‌ধুক্‌বুকে বাজে 'ভুল' বাজে 'ঠিক'—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে হায়!

এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহুলোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছু মাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ী ননদী, হাফিজের বেলা,—

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে !

এ স্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,—

হাসনজানের রূপটা দেখি ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসন রাজার বুকের মাঝে কুটে।

রিয়াকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক', 'ভুল, ঠিক'।

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের স্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস-আশ্রমের অভাব অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাসবাসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পগুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্বগ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করে নি, তার অর্ধেক ধ্বসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তিনীড় বলে মনে হল।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেন নি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্ব-সংঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি[১], এমন কি কারো সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :—

---

১ জাতকের গল্পে আছে এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোন সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়তো জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাঁচীর ভাস্কর্যস্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই
জীবন-সাঁঝের শেষ ক'টি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া—কাটাব দিবস-যামী।

কিংবদন্তীচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছু দিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেন নি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিও তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা' কবিতাটি আমার মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলোঝুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল। তদ্দণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলাটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত—তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তাঁর তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপ-চাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয়?'

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেন—পরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?' তার পর চিনতে পেরে 'থ' হয়ে বলল, 'সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?'

রিয়োকোয়ান আস্তিন-ফাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পারো না!'

'চলো' খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করবে?

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।

জাপানে 'চলো' খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাধাসাধি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা খেলবে ?' রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, 'কিছু একটা বাজি ধরে খেললে হয় না ? তাহলে খেলাটা জমবে ভালো।'

রিয়োকোয়ান বলেন, 'তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জামা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।'

মনসুকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি ?'

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি ? বললেন, 'আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।'

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, 'তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাইতেই আমি খুশি হব।' রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু, আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়োকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন :

'চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।'[১]

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু "চলো" খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না ? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।'

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, 'এক বার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।' রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন।

১ খুব সম্ভব কবিতাটির গূঢ়ার্থ, 'বাজী জেতাতে বড় আনন্দ, আর বাজী হারাতে বড় দুঃখ।'

সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেক বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, 'এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি', কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।' আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটাই বেখেয়ালে সব কটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'এইবারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।'

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না—গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্ট করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি জ্বালাতন করলে তিনিও 'দেব' 'দিচ্ছি' করে কোন গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, 'ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।' এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে—আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো—ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্রমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, 'ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিই নি। আর ঐ যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই

আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখা যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।'

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন 'চলো' খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলকেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি— রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ংকর চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এ-রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।'

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেছ, খুলে বলো।' রিয়োকোয়ান বললেন, 'ভারী বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।'

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, 'তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।'

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদ্দণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরযত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বেবাক

ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা আরম্ভ করা যাক।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।

কী বিপদ

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলো করতে ভালোবাসতেন। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে বড় বিপদগ্রস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।' রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দু'গণ্ডা পয়সা হয় কি না হয়।'

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেক জন বলল, 'আমাকে দুটো রায়ো দাও।' কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলমের মত দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এ-রকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। এ-রকম করছ কেন?' কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। ও-রকম ধারা করছ কেন?' তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চেঁচাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

* * *

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎ নিয়ে

দিন যাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাল্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই,—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ
শান্তি বিরাজে ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝ।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। গুরুর মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তাঁর পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

রিয়োকোয়ান শান্ত ভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশাই ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায়ঃ—

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।

সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়'; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপদ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি 'পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী—তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহবেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

"—কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?" (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের শব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যে সব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,—

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন্ পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে পরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা
রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা
প্রতিবিম্বিত আমার আত্মা—এদেরই হিয়ায় আঁকা॥

ফুটবল

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন ; আমিও দূরে থেকে বিস্তর সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ও'দের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদগদ হয়ে মনে মনে ও'দের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে 'ইস্টবেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায় তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন 'ইস্টবেঙ্গলে'র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশি হলুম বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সক্কলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সব কটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার 'বী' টীমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাবো কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কি বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

* * *

দিল্লীতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে—শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, আরে বাপু, মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের "ডাকঘর" দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালী—তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ও-পারের—আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারী এসেছে গোর্খা টীমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালীঘাট'

ফ্যান ছিলেন না, সে-কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নীস্ত, লেকিন দুশমন ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়' তবে শত্রুর শত্রু' এই ফার্সী প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজী বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইষ্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্‌সে কপাল জোরে, ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে (সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ইষ্টবেঙ্গল !) আর পদে পদে নাকি অফ-সাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে দু'ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

* * *

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইস্ট-বেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটা চারেক ফাউল করলে আর ইস্টবেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, হে মা কালী, বাবা মৌলা আলী, তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয়না—এ কী গব্বযন্তনা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইস্টবেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা।

নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেল তখনো আঁটকুড়ী—গোল হয় নি।

ওহে চানাচুর-বাদামা-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে ; তা দেবে না ? যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি আর কবার হুইসিল বাজালে ? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

* * *

হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন ! গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কতখানি প্যাটার্ন উইভ করলে, কে কজন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা

তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু'পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি বলটা ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল 'গো—অ—অ—ল !' ('রূপদর্শী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot'—Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল নহী থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, "মুখবন্ধ"। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরোলো না হলে—।'

* * *

এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।

এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনাল জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢিবিতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শাঁ করে আরো একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল গোল!

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদের-ই বিজয় নাইন-নাইণ্টি পুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বেমক্কা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই—নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিন্দনীয় এ-কথা কোনো আলংকারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, এ-কথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয়, তখনই আমাদেব আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই 'রাবণবধ' পালা 'ডাকঘরে'র উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে—তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুর্জুয়া বলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছো না, তখন নিরীহ বুর্জুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারি নে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন, সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দুদণ্ড ফুর্তিফার্তি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে ঢোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধ-বয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ—অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যই—নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, কিম্বা 'লোক দেখানো'র জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠি নে, কিম্বা যখন খানসায়েব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠি নে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারি নে, তবু যে করি নে তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারি

নে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না—কিম্বা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন এ কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না!

তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।

কম্যুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুর্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহন্নত, ততোধিক তকলিফ বরদাস্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেরও হতে পারে,—জানি নে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতী গরবা! বলেন, 'পশ্য, পশ্য'—থুড়ি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ।'

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণ-নৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে 'মরি, মরি'? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে কথা বলছি নে।

আলো-অন্ধকারে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠছেন না—এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাঁদা-ওলা কলসীতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দ মধুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, 'সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদী এনেছ কি?' দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পোঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি-উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে-নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্ছা তো যায় বটেই, তার উপর মাইক্রোফোনযোগে চিৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয় 'এ নাচ বড় উমদা নাচ—'। এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী

অর্থাৎ নিম-কম্যুনিস্টি কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপত্তি জানবার এই তো প্রলেটারিয়েটস্ট অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।'

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন'?

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন'? যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই— আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

*　　*　　*

দিল্লীর ফরাসিস ক্লাবের ('সের্ক্‌ল ফ্রাসেঁ' অর্থাৎ 'ফরাসী-চক্র') এক বিশেষ সভায় মঁসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসী গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসী রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসী-জাননেওয়ালা ফরাসী অফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,—

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি,' 'উবিগাঁর' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসী বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসীতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারানুসন্ধান, 'হাসি কেন'? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লী শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয় নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসী রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসাঁ রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসী কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালাড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসী রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সের্ক্ল ফ্রাসেঁ দিল্লীবাসীকে তার জন্য তৈরী করে আনছেন।

* * *

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওতরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।'

'বলেন কি? তা, তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

গাইড

দিল্লীতে একটি সরকারী টুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লীতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরেদেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম—ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরী) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লী অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লীতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলা উদ্দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুগলকের গুরু) আর দিল্লীর বাইরে শেষ গুরু নাসির উদ্দীন 'চিরাগ-দিল্লী'র কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

এ সব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত।

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তিভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।'

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

* * *

দিল্লীতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজা-গুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশী যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুরে বেরতেন সোনার-পাত মোড়া গাড়িতে, বীবীসাহেবা বেরতেন রুপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়ীতে দেহ-ত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।'

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ! এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন।

* * *

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে!'

আচার্য তুচ্চি

দিল্লীর ইন্ডিয়াম কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে

জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয় আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট; তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

* * *

ইতালির ইস্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল—টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত-চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

* * *

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫এ এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'জানো', সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্য-নাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়—তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।'

এবং আশ্চর্য, আমার মত মূর্খদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর—কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহুনের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে, অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই, সাংখ্য বেদান্তের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

* * *

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুনদ্জিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, 'উপস্থিত মাদ্জিনি পড়ো।'

তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যে রকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেন নি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা-শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।'

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন—তাঁর ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদ্জিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদ্জিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদ্জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদ্জিনির ভাষায় বলতেন,

"আভান্তি, আভান্তি ও ফ্রাতেল্লি।"

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—"

'আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।'

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি?

* * *

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভরেত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়,

বাঙলা, হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতি-মধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

* * *

সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালীতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে।

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

* * *

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন ॥

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখে নি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনি নি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, "সিডিশন", "ডিফেমেশন", মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই", এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানি নে, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলোবার জন্য যেসব আইন-কানুন

বানিয়েছে, সেগুলো কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনী, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখিকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকমধারা কাজে লাগানো যায়, সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপুর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি, তাও বলতে পারি নে।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করি নি। তক্ষুনি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।'

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানাঅজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়ীতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের

মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একদিন চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয় নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, এই লোকটির সংস্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ। আর কী একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি! আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারে নি।

তাঁর বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিনি দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পান নি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে।'

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসার থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোন দুঃখ নেই—আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লী শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।[১] মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লীতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যামোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা "মৌলানা খাফী খান" আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকব্জা কারখানা

১ স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

ফ্যাক্টরী তৈরী করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক একটি আস্ত 'বিদ্যাসাগর' ; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল ব্যক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধা-গুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি ?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ'। আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনোগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যিসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল বলে তাঁর বেশী সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহীত্যকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধটিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো বলা ভুল হয় না।

চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম। এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি নে। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কি কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ত করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল একখানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'সা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানি আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরী হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও' ঠিক তখন তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলং? যথা পূর্বম্ তথা পরম্।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করি নি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁত ঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারি নে।

আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্রা, মজার বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যান নি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিন-বাস রসের বাজারে আসর জমাবে।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি নে॥

মপাসাঁ

বাঙালায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,' পদ্মার ওপারে বলি,—

'পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে,'

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ পরে পোষা মুর্গী

মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁর বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য—আর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন—মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, 'কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।' (অর্থাৎ মপাসাঁর যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, 'বিদেশীরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র‍্যাঁবো। মপাসাঁর কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরাব দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক—কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চার্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।'

এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল বলছেন, 'আমেরিকার লোকে মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া মাত্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতোল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।'

উত্তরে বিইঈ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলণ্ডের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসী ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।'

চলতে পাবে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়ে-ছিলেন। বিইঈ বলছেন, 'ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।'

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, 'আজকালকার ছোকরারা বড্ড

১ M. Edouard Mayniai এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondance inedite.

বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বুই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঈর বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী।

ভাল লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজি, জর্মন, রাশান, স্পেনিশ, এমন কি আরবী, ফারসী বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন্ সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তস্থলে—মপাসাঁর যেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নূতন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়॥

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদান-প্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনো হয় নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবী তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'ম্লেচ্ছে'র পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন

পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনীর মামুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আল-বীরূনী অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবী ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে-যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবী-ফার্সীতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল-বিরূনীর পর যদি সত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে, শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা-শীকূহ্‌র কাছে। আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—হেন সূক্ষ্মতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে পড়ে।

তারপর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসার, সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী কোন গতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তারপর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এই আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাংলা দেশেই জন্মালেন এক বাঘাপণ্ডিত, এক 'জবরদস্ত মৌলবী'—যিনি কি আল-বিরূনী, কি দারা-শীকূহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব নানা সংঘাতের ঊর্ধ্বে যে সত্যশিবসুন্দর আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফার্সী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হীব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে-শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা-জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল, তাই নয়, সে-শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয় নি। 'দেশে'র এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে-শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে

সে নিপীড়ন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ।

আরবী ভূমিকা (মুকদ্দমা) সম্বলিত তিনি যে ফার্সী কেতাব রচনা করেন, তার নাম 'তুহফাতু ল্ মুওয়াহ্‌হিদীন' (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশ্যে উপঢৌকন) এবং সে-গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে-বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে-রূপ সে-বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিন্দুমাত্র উল্লসিত করে নি। পরবর্তী যুগে মৌলবী-মৌলানা, আলি-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবীরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' (স্বাধীনচেতা)—গোঁড়ারা যেরকম ভদ্র ব্রাহ্মকে 'বেহ্মজ্ঞাণী' নামে দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন—নাম দিয়ে তাঁর সৎ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই তো তিনি পেয়েছিলেন 'স্বধর্মী'দের কাছ থেকে। অদ্বৈতের অনুসন্ধানকে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় ম্লেচ্ছাচারের মত বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন—এ-ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজ থেকে। যে খ্রীষ্টধর্ম তখন বাঙলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল, সে-ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ধর্মের চেয়ে কোন দিক দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আগের অনুসন্ধানে তিনি বাইবেলে যে খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন, যে-খ্রীষ্ট 'কেরামতি' করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভেল্কিবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে-খ্রীষ্টান মিশনারীরা এতকাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, 'রামমোহন মূর্খ', রামমোহন যীশুকে চিনতে পারে নি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যীশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যীশু নন।

হিন্দু-মুসলমান সে-যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধে-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করে নি। কিন্তু খ্রীষ্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—আজ ডীন ইনগ্ সেটা বুঝতে পারবেন।

তিনি ধর্মের গলা-মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হন নি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য॥

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী—স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক

সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

জীবনের বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায় নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্প বয়সে কীটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মতো ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালীমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বভারতীর নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারই একটি নিবেদন করি।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর' প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি যে ইস্কুলটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা বা বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পন্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্‌স্‌ বগ্‌দানফ বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।[১]

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে

১ সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আছি।

আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাঙলাদেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেভি এঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে—এবং এস্থলে ভক্তিভরে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

এখনো আমাব স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ঃ "দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস্ ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্‌ফারিং অব ডিগ্রীজ।"

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে ইনি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন্ ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তখন কোনো যোগ-সূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্তত একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শান্তি-নিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র! তারও একজন রসায়নের ছাত্র—আর পাঁচজন যে রকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে!

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা॥

নাগা

৩১শে আগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর[১] লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যায়।

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোরা এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।

নাগা পাহাড়ের যে অংশটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। মিশনরিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব 'ম্লেচ্ছ-সংস্কারে'র কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে—এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন—ব্রিটিশ নাগাদের ভিতর এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয় নি—বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নির্বীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলা বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শুয়োর ছাগল ত নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মুণ্ডু

---

১ বাঙলাতে সাধারণতঃ 'জওহর' লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। 'জওহর' কথাটি ফার্সীতে একবচন এবং অর্থ বাংলাতে যা তাই। 'জওয়াহর' কিংবা 'জওয়াহির' শব্দটি 'জওহর' শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফার্সীতে আসলে শব্দটি 'গওহর'; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় 'গ' নেই বলে আরবরা 'জওহর' লেখেন পরবর্তী যুগে 'গওহর'ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম 'গোহর' ও জওহর' একই।

কপাকপ কেটে নিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?

ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নির্বীর্য করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝুঁকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?'

অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুত্তিন মেশিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চূড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় এবং সে চুড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চুড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চুড়ো আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পেঁছিতে পেঁছিতেই সব কেচ্ছা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তা হলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছ না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়—কোনো কিছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; পুজো করতে চান, না করতে চান—একখানা কিংবা বিশখানা; পুজো-পাজা করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুঁদ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ

করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাস করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, এ-কথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।

শুধু হিন্দুশাস্ত্র না, ইহুদি খ্রীষ্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদী বলে এঁর বাড়িতে দালানকোঠার গোলকধাঁধা ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট নাকি বলেছেন, যেহোভার আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এন্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড্ড বেশি ডরাই নে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাই নি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাই নি কেন? চট করে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র্‌) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মতো শাস্ত্র নিত্য সেব্য।

সে কথা থাক।

হিন্দু-রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।

হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন,—তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই—হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,—কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বীর চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নূতন কোড দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট—ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মৌলা বখ্‌শ্‌ মিঞা যে-কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলবী বোঝায়।

বেগম মৌলা সতীসাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা—বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নূতন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তন্দণ্ডেই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই—নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন ; তাঁর কোন অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিররুগ্না, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ—এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সেকথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু ? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না, তাঁরা উত্তরে বলবেন, আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম ? 'মহরে'র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে ? মৌলার মাইনে তিন শ টাকা। 'মহরে'র টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব ?

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ, একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তন্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরী করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারে'র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সে কথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদন :

মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে

তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক্ মোল্লার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মোল্লাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মোল্লা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

* * *

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনো কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়। স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'অ্যাটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিগ্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন ; এক কথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, 'এই রইল তোমার স্ত্রীধন, আমাকে খালাস দাও' কিম্বা যদি বলেন, তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই, তবু স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তাঁর স্ত্রীধন তদ্দণ্ডেই চাইতে পারেন—কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দুজনের বিরুদ্ধে 'বিগেমি'র মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে

মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস—অত টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে ?

তখন সাধারণত মুরুব্বীরা মধ্যিখানে পড়েন—বিশেষত সেই সব মুরুব্বীরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ‘তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয় নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছ। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।’

বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, ‘না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।’

মুরুব্বীরা বলেন, ‘তবে ঢালো “মহরে”র টাকা। না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচ্‌ড্ হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।’

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালাক দিতে রাজী হয় না।

কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, “মহরে”র টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তায় যদি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বার বার কুৎসিত রোগ আহরণ করে স্ত্রীতে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন না।

শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ‘তুমি আমার মায়ের মতো’ অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা —কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

* * *

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তি-নিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিনই তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি—আমার মনে হয়, দেবদূতেরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

* * *

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি—অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায় ? এ তো ধানকলের ধোঁয়া !'

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।'১

সে যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

* * *

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন আটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরী ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন ?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয় স্রষ্টার আনন্দ'।।১

---

১ পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

'জিদ-ওয়াইল্‌ড্'

আন্দ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জুর্নাল'গুলো (ডায়েরী) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্স-দেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন্ পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্ রঙের ? অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি ?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইল্‌ড্। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইল্‌ড্ও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইল্‌ড্ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত : তার উপর ওয়াইল্‌ড্ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তাঁর চটি বই 'অস্কার ওয়াইল্‌ডের স্মরণেতে লিখেছেন 'ওয়াইল্‌ড্ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নূতন ধরনের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া, আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো ওয়াইল্‌ড্ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—যে-লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কক্‌খনো পরিবেশন করতেন না। যার যে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিংবা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গেঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইল্‌ড্‌কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনেওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser)।'

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ওয়াইল্‌ড্‌কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়' 'ভাঁড়' রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।' তাই বোধ করি ; জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে

টক-টক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম করে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্‌ড্‌ কোন্‌ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্‌ড্‌ দেখেন লণ্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্‌ডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেন নি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্‌ড্‌ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দুচার বার দেখা সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্‌ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন 'ওয়াইল্‌ড্‌ যখন দেখতে পেলেন দু-চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্‌ড্‌ এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্‌ড্‌ দুটো ককটেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্‌ড্‌ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইল্‌ড্‌ সম্পূর্ণ ভুল করেন নি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, 'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তারপর দুজনাতে কি কথাবার্তা হল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্‌ডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেন নি এবং আরো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন ॥[১]

এষাস্য পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে এক দিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলিকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন্ পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে

১ Andre Gide: Oscar Wilde, In memoriam, Paris, Mercure de France.

তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবরের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামিশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইসলাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্ব-প্রকার প্রগতির "এনিমি নাম্বার ওয়ান"। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়-কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রঙঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া' —সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবকযুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিক্স্ পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়—তাতে বায়নাক্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী,

ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতাবিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি ॥

দিস্ ইয়োরোপ!

গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লণ্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সর্‌বন্ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আরো সব লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে শুধু-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু।

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দুরদৃষ্ট অতিশয়।[১]

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইস্ট-

১ সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।

দেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিবত-তব্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যাণ্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেন নি।

তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে আজাদ হিন্দের বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ-জর্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর ঝেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যাণ্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কি করে নিষুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমাণ্ডাণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু 'পাত্রি'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসী-জর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবিশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে 'দম্ভী বীরে'র মূর্তিতে দেখা দেন নি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেণ্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল।

ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায় নি। ফরাসীরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় নি।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

* * *

কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।[২]

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখি নি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানি নে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করি নি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলব? সর্বকনিষ্ঠ চিররুগ্ন কোন্ ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড্ জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি সহজে কাতর হই নে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি

২ Girija Mukherjee, This Europe. Saraswaty Library, Calcutta.

যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মন্তুদ ব্যাপার কি হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি—নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ্। দাদামশায় আসলে কুষ্ঠিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন "ইডা" "সিডা" নিয়ে আছেন।

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শুধালুম,'তুমি আসছো তো?' শহীদ বলল, 'না।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন? আমরা তো "হাসি" না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই-না jolly chap—আমরাই শুধু গম্ভীর।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হই নি।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরী করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

সেই সময়ে দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বললে, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ

কোর্মা-পোলাও! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলী খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

* * *

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

দিনেন্দ্রনাথ

'দেশে'র ৪১শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্র-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রম-সাফল্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য। তাই বোধ হয় তাঁর কণ্ঠে যে রকম 'জনগনমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলাম না।

এরকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় ররীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই—তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরম্ মহারাজের বীণকার—তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমঝদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাত্রে কটা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের 'খাবার ঘণ্টা'র অনেক পর অবধি—বারটা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দুজনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। এককন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়ক রাও এঁর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন—ভদ্রলোক দিনে অন্তত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন—আর দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নেড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন—তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, 'দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?' যদিস্যাৎ পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পড়তে পারতেন। ওদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটারনিৎস্ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে—আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর

সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবৃন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি ; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভালবাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ-সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নূতন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শনে'র সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য অমিত ঝঙ্কার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানি নে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দে শেষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্রনাথের হয়তো ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছি নে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাঙমুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নূতন শাস্ত্র গড়া যাবে॥

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণ-সঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে - অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়ও ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি

তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলীল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন-উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ আহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজনমত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চীৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদনৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া ওঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ —গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্য-বহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম্। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশীলাদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পারিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার

বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব, নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুধুমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভারত নাট্যে যে-সব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম্ অনেকটা ভরত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে-নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বা-নুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রা'র ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্র-সারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে-পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপকরূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবদ্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সংগীত চিত্রাংকনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সংগীতের মজলিসে, স্কুল-কলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদসঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফাণ্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তকনর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইঁহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশীর ভাগই তো দেখতে পাই দুই-একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলানো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বার বার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যগত

নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাঁহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না ; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন ? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র ? সুকুমার কলা কি কখনো মৃতদগ্ধ চিন্তা অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে ? নৃত্য তো শুধু তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সুচারু পদক্ষেপের নামান্তর নয় ; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই ? এখনও কি ধর্মের আচ্ছদেনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই ? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই ? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানবসংসারের চিরন্তন দীপান্বিতা প্রজ্বলিত করিবার কোন প্রদীপ নাই ? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুক্ত হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সংগীতে ও নৃত্যে॥— (শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনুদিত)।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পানামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন ?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীয় পুস্তাকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" কেউ পড়েছ?' বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানে পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল?'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে! এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে, যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তাঁর চরিত্র-বলের দরুন এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর

ভিতর মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, অ্যাণ্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

* * *

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পতেই চোখে জল আসে আর এ বইয়েতে বেদনার কাহিনী 'অল্পে'র উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফ্‌স্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামান-জীবন (জীবন না বলে 'মৃত্যু' বলাই ঠিক)

বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন্ জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের কল্পনা তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে কত হৃদয়বিদারক ছবি এঁকে আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকু ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই ;

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াসে বাজ তোড়ায়ে"

"ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু ! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে ; তুমি ধন্য।"[১]

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন ; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু এ-কথা বার বার বলব দস্তয়েফ্স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলী জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন ? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা ;—

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে ; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে ; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"[২]

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি ;—

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান
বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"[৩]

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের

১ নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬০

২ আত্মকথা, পৃঃ ৬৬। ৩ সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

অন্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্কাতে তো-কড়া ভাষাতেও তাঁর তেমনি কায়েমি দখল।

'বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢ‍ঁুঢ়ু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি"। [৪]

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ বাবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও 'এস্তেমাল' করতে জানতেন।

"কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদা-তাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। [৫]

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালী। তাই,

"আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদগতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী।" [৬]

বাঙালীরা এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনি নি।

কিন্তু এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না আরবী-ফারসী, না কলকত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক'জন লেখক?

"শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞেসা করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, 'লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'বাড়িতে ছেলে আমার পেলোওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।' ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই,

৪ আত্মকথা, পৃঃ ৩৩। ৫ পৃঃ ১১৯। ৬ পৃঃ ১২১।

তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।[৭]

* * *

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহী ব্যাপার!' ফলে শাহ্‌জাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরী করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হল—ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, 'এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা উর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।' যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, 'গোরা'র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না! আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি 'ওয়ার অ্যান্ড পীসের' মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল,

---

৭ পৃঃ ৬৯, ৭০।

কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?'

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালী হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মৈঁ ভুখা-হুঁ' তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—

"কালী তুই করালরূপিণী / আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো,' তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যুষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।' বললেন, 'এর নাম "শঙ্করবরণম্"—সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।'

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যেরব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিশ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শানিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইণ্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুকরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্সটকে বার বার নমস্কার॥

জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি. এ., এম. এ., পি-এইচ. ডি. ডি. লিট. যা খুশী বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়—এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু-একজনের ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন—নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্ন-সন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরংকুশ আনন্দায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন ততঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছু না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগল না এ-কথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লভ দেন ডু নাথিং উইথ ইট'—স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাব না একথা, ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, রাজনৈতিক স্বরাজের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ হস্তগত হয় কি না। এ-লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না, কিন্তু অন্ততপক্ষে এ-তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কর্পূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতাটাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধর-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচাও তা হয়ে যাব কিংবা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছু বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন।

এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি?

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই—কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খর্চা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাট-বেলাটরা বিলিতি কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পরট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো; তারপর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।'

ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, 'কেন? টিটো?'

উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো ইংরেজে বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝাওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয় পন্থা' তিতু-মীরের বাঁশের কেল্লার মতো তিন দিনও টিকল না। তাঁকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এর পর আর কোন্ সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে—মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে? মার্কিন ইংরেজের "ডিমোক্রেসি" এমনিতেই শোষণ-পন্থী তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নির্মূল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দুমুঠো অন্ন দিত তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে? যুগযুগসঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি "বুর্জোয়া" বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁর আপনজন ভার্গা, ভাভিলফ, কল্‌ৎসফ হয় "পেনশনে" নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নীচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো শেকস্‌পীয়র থাকবেন কিনা তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আণ্ডা-মাখনের ছয়লাপ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক

'সাতোশেকস্‌পীয়র পড়তে পাবে না শুনে স্তালিনী কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না।'

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারী পাদ্রি-পুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারীকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেওয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভাটিকানের আপন দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।

ইয়োরোপে মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না।

অতএব? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশি একটা বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।

* * *

আমরা যদি হটেনটট হতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর অত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়তুম। তারপর যা-হবার হত। (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কল-কব্জা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)

'ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই।' সে নির্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি—হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এযাবৎ পাই নি।

কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত-যৌবনা অরক্ষণীয়ার মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মাল্য পরিয়ে দিতে পারি নে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্রাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে, এমন কি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই 'আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে' নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের

দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপর্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ঠিক বলছ, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।'

কোনো বিশেষ 'সত্যযুগে' ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নূতন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মতো কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ 'সত্যযুগে'র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমন কি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর 'সত্যযুগে' বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান। তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ "ভারতীয়-সংস্কৃতি"-কে "অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে"।

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই 'অচলায়তন' যার অন্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নূতন 'ডাকঘর' যার ভিতর দিয়ে রুগ্ন অমলকে বাণী পাঠবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

মার্কিন না রুশ না, এমন কি ভারতীয় কোন বিশেষ 'সত্যযুগ'ও না— এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো? আমার মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন্ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হই নি—এ বড় কম আশার কথা নয়॥

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোকে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল ?—
রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারীর ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্রলান, Gruess Gott !
বেতারের সুরটা টাঙেগা না ফক্স-ট্রট ?'
চট করে চটে যাও পাছে !
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যবনিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশে রাখি
বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি ?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে ?
রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা ?
ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।—
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে ?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত ।।

নয়রাট

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জেদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাত-দুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাকা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি—এ তো অবিশ্বাস্য', আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করি নে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরুই নি। ছ

পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘন্টাতে ঘন্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি ? আট নম্বরের জুতো ছ টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ-নম্বরী পা-কে আট নম্বরী পরাতে যাব নাকি ?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যে রকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলি গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালীকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু-হবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম,' অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না ?'

খাসা চাল তো ! ওদিকে কারো নজরই যায় নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসুন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন—যা বললেন—তার অর্থ 'হরিবোল বল হরি !"

আমরা লক্ষ্য করি নি কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন, গজটা পেঁাছয়ে নিলে হয় না ?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম

ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

* * *

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি—একটা ছোট নড্ করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম, 'বসুন, বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, "বসুন", হুঁঃ, "বসুন"। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শুধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদ্ঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন,

তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু স্যর, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা নয়রাট্‌।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের-মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্‌ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের "চিড়িয়াখানা" দেখতে যান নি, শামুনিক্‌স্‌ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেনে নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইট-জারল্যাণ্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কী বল?'

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণ তো আর দাবা-খেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাই নি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্‌ ব্যথা-ভরা সুরে বলছেন, 'গিন্নী, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ। ভুল করেছি। ফ্রান্ৎসিস্কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, 'আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেন—ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায় দু-একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা। খেয়েছে।

ফ্রান্ৎসিস্কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্ট্ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্ট্ ক্রীম।'

হ্যার নয়রাট্ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, 'দেখলে গিন্নী, কি রকম অদ্ভুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছি, স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন "দি আইডিয়া, আমি দু বেলা ঐ জিনিসই খাই"।'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ।

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে।'

কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নী, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না! বাপ্স! মারি তো হাতি লুট তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না!'

আমি সবিনয়ে শুধালাম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?'

ওদিকে দেখি, ফ্রান্ৎসিস্কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, 'তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব।' আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম —এই বা কি কম সান্ত্বনা।

*　　　*　　　*

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরো দুখানা মাছভাজা দাও', নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছভাজা দাও।'

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্যুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি। তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গীর হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপ ঃ—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণ-সম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত—কি না?

উত্তরে এক 'খানদানী মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে—কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুর্গীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন

জর্মন এবং সুইস্ রেস্তোরাঁয় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোট্টো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসী-ইতালী আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে—বাপ্স্। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বড়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা সামনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সব চেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনে যেতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ

হোক না কেন?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?

* * *

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানা-টেবিলের পাশে পেঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গর্ভমেণ্ট, (পোলাণ্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় 'পোলিশ গভর্নমেণ্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্ৎসিস্কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এর-ই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আবার বিদেশী।'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাহেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রান্ৎসিস্কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্ৎসিস্কা ভয়ংকর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরো সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্ৎসিস্কা বললে, একজোড়া ফেন্সি নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮্)—আমি বললুম আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্ৎসিস্কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্ৎসিস্কার মা! বাপরে বাপ্! আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রানৎসিসকা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মেরির। এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা' যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে—আমাকে না বলে—লুৎসের্ন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়ীকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উবু থাবড়ায় —মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছেন -কখনো বাঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরল ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনের মিনিট—ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ী মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!"

পেটার বললেন, 'ডালিং' কিন্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফাস্ট প্রাইজ, আমি সেকেণ্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করি নে।'

ফ্রানৎসিসকা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নীর রাগ, আমি ওর সংগে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না, আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, "যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন"।

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নী অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউই এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা "ট্যুনিস", "শেলে"র গল্প আছে। "ট্যুনিস-শেল"কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।"

'আগাগোড়া একটি "প্রতিষ্ঠান" বলতে পারেন। "ট্যুনিস্" কথাটা এসেছে

লাতিন "আন্তনিয়ুস" থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী, খানদানী ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস্ অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের "পঞ্চানন" নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ "পাঁচু"টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর "শেল" কথাটার মানে "ট্যারা"। বুঝতেই পারছেন, পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ড্যুক ব্যারন নন—খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুর্তিফার্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

'একদিন হয়েছে কি, ট্যুনিস্-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?

'ট্যুনিস্ বললে, "চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।" দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দুখানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে দুখানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, "ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।"—যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধালে, "কেন, কি হয়েছে?"

'শেল বললে, "ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।"

'ট্যুনিস বললে, "অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?"

'শেল দম্ভ করে বলল, "নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।"

'তখন ট্যুনিস বললে, "সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?"

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'ভাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে

শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু'দিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা, কত হুজ্জত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রানৎসিস্কার আপত্তি শোনা গেল, "পেটার, আবার অশ্লীল কথা !") তবে দম ফেলবে কি করে ? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট—প্রাণটা যায় আর কি।'

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন ?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানি নে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফোঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে ওদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রান্ৎসিস্কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই ; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, ওরিয়েন্টাল্ কার্টসি'। যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মস্করার পর মস্করা করে যাচ্ছ।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনে, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম ?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতা-রক্ষার চেষ্টা আমারাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্ণৌ। সেখানে কোনো খানদানী বাড়িতে নিমন্ত্রণে খেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন্ মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন্ সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন্ নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নী উভয়েই শুধালেন, 'আপ্ত-বাক্য কি ?'

আমি বললুম,—

'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি ॥

অর্থাৎ,—

ওরে মূর্খ, নেমতন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া

করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।'

* * *

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'—রান্না সত্যই মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয় ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নার শখ ?'

আমি বললুম, 'না ; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনেন, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরী করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই ; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরী করে দেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি ?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরী করেন কি করে ? মা বলেছিলেন,—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"আরে বাপু, রান্না মানে তো, হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এর-ই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস আমি তৈরী করতে পারব না কেন ?"'

তারপর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনো এস্‌পেরেগাস্‌ কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো খেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সব্জী আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বুদ্ধিমতী মেয়ে বললেন, 'ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠেপড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরো-দস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'থামলেন কেন ?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুংকার দিয়ে বললেন, 'ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্ৎসিস্কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্ৎসিস্কা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশীর জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না—তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন নূতন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেলপেন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক্ রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন এন্‌গ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিণ্ট, আকওয়াটিণ্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সব্জী থেকেও নূতন রঙ্ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা "এরজাৎস" সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ী শাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর 'মিঠাখানা' তৈরী করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন যেন লজ্জা পেলুম।

* * *

রুশ কবি পুশ্‌কিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়।'

পুশ্‌কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু'পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রী করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছি নে, পেটের ভাত '—'র[১] কাপড় হলেই হল।

'অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রী ক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে—পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তনখা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয় নি। পার্টিশেনের পর মারোয়াড়ী কারবারীরা যখন তার 'বস্'কে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠেপড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৌশল' বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল[২] লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস্-গুপ্টা', বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'লৌচি' (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্-গুপ্টার ছেলেদের জন্য পুজার বাজারে দু'চারখানা 'ডৌটি' (ধুতি) ও রেখে যান। আমি বরাবর

---

১ শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পুজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

২ 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ', সমাসটা বাংলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহারাম' 'নেমকহালাল' কথাগুলো কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' 'অকৃতজ্ঞে'র চেয়ে জোরদার। 'নমক' = 'নুন'—তার 'অপমান' (হারাম) কিম্বা 'সম্মান' (হালাল)।

সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চস্বরে শেলি-কীটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্রধারী ॥
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি।
খটন্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
'গ' রে গরুড়—ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন—যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু'তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক'লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক'খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পী') নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ' হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রী করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানি নে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজী পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো!'

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো!'

'উই গো!'

'উই গো !'

'ইউ গো !'

'ইউ গো !'

'হী গোজ !'

'হী গোজ !'

'রাম গোজ !'

'রাম গোজ !'

'শ্যাম গোজ !'

'শ্যাম গোজ !'

দাশগুপ্ত সর্দার-পোড়ার মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চীৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, 'রাম অ্যাণ্ড শ্যাম গো গো গো !'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সাংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকী জীবন তাঁকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখ-বিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐশুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুন কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন ? আমি বলি নি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, 'অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে !'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।'

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁ'টা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকট্রিরি আছে—ব্যস্ আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।

'রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্ৎসিস্কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'চোপ্।'

নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্।' তারপর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলাএকলি বলব।'

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্ৎসিস্কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, "ব্রেকফাস্ট তৈরী।"

'ফ্রান্ৎসিস্কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার "চোপ" এবং "আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ" শোনা গেল), ডার্লিং তুমি আমাকে কত না ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।'

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।"

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল-মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।

তখন ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ

৩ 'পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব', দ্রষ্টব্য।

বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্‌টিনেন্টাল শুয়োরের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পর্ট্রেট এঁকে-ছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, "একশ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কিনা।" '

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ; আপনি কি বলেন?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব'লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, "তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?" বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু'বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন ; খুড়োর শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বল্লেন, 'অতিশয় হক্‌ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীশ্চান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সবপ্রাদার। দাবাড়েদের "পেন্‌ফ্রেন্ড" পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তারপর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাই নি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদয়াস্ত যে লোকটা "ট্যানিসে'র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়।

তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, "রোজার পয়লা রাত্তিরে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেহুঁশীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।" তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদ্‌বদল করেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই ফিট্‌জিরাল্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিট্‌জিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই-ই বাদ দেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, "ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ" তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, "এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন্ নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু'দিন এ সংসারে আছ সে দু'দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।" তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলাম-বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তো হয় নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

'তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্‌প্লীট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোন্‌গুলো, হাফিজের কোন্‌গুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর

৪ 'সুফীরা মদ্য 'ভগবদ্-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫ 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

'অত সব বয়নাক্কার কী প্রয়োজন!

'এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবী গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন; খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন্ সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়ত খুব বেশী মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে চলতেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এ তো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?'

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব্ চেস্। আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘুঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম 'ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা

দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।

'এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

'মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকা-মুটেকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজী, কি ফরাসী, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচশ' রকমের সেন্ট বিক্রী হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্কিমো ভাষায় সম্ভবে?

'ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে এক-জোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বেএক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে "সুইটজারল্যাণ্ডে ঘড়ি আনার মত"।

'ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত—"শক্‌ট্", "আউট-রেজ্‌ড্"। আবার ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং "শক্‌ট্"।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের "মেলে"), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীশ্চান আর নীগ্রো ক্রীশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চমকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।'

*　　*　　*

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্‌ও তা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল্‌ নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আরেক জনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্‌ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্‌ল্‌, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্‌ কিম্বা পল্‌ডি সাইক্‌ল্‌। ওমর যে-রকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল্‌ তেমনি জর্মনীর কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজারল্যাণ্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্‌ল্‌ আছে?'

আমি বললুম, 'এন্তার! হর-পার্বতী সাইক্‌ল্‌, গোপালভাঁড় সাইক্‌ল্‌, শেখ চিল্লী সাইক্‌ল্‌ এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কি?'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি—বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু শ্লীল, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, 'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse—পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে "ডার্ট" বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, "ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো", বলে, "ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।" ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,

'অধরের তাম্বুল　　বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি,

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমারের গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে ?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে, গিন্নী শুনলে ? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্রীষ্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ঢিড্‌ মিথ্যেবাদী রে, বাবা ! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ—হ্যাঁ পুরুষই বটে—শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক ! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—"হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী !")'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন ?'

নয়রাট বললেন, 'Per se বাই ইটসেলফ যেরকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনো জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।

'অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্বল্যমান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প শ্লীল—তা সে পঁচিশবার দান্তের বয়ানই হোক, গণিকা-জীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেণ্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ভটচাজ মশাই ('পাদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পল্‌ডি গল্প বলুন।'

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পল্‌ডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্‌। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, 'পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্‌ দিলে কেন ?' পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ঐ তো ! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না ; জোর টিপস্‌ দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না ?'

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, "কিংবা ধরুন, পল্‌ডির বুকে ব্যাথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, 'ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।'

পল্‌ডি হেসে বললেন, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ও-গুলোর ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল্‌ সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল্‌ একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্‌ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ খ্রি-ফোর্থ অব ল'। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, "তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।" শেল্‌ বললে, "গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।"

'তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

'তখন ট্যুনিস বিস্‌মিল্লা বলে আরম্ভ করলে,—

"পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পেঁছিলুম এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়ি-গুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়। (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভায়ংকর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পেঁছিলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর—"

"শেল্‌ বাধা দিয়ে বললে, এতে আর মিথ্যে কোন্‌খানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।"

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেন নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা?'

নয়রাট বললেন, গল্পটি যদিও খাস কলোন শহরের, -তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে।- এ গল্পে দুটো 'সারপ্রাইজ', কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি;—

'ট্যানিস আর শেল্, যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা সেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যানিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পেঁচেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, "ছি, ছি, বাছারা; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বের করছো কি করে? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নি।"

'ট্যানিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেল্‌কে বললে, "ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে; আম্মো পারবো না।"'

আমি বললুম 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রাট বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।'

'ট্যানিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যানিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে "নোটের সাব্-সাইকেল্")। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিস তাদের পেঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যানিস শুধালে, "ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায়?" শেল্ বললে, "আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।"

'শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, "ওরে ট্যানিস—আমরা ভারতবর্ষে পেঁছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।"

'ট্যানিস তো তাজ্জব। শুধালে, "কি করে জানলি?"

'বললে, "করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, "Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges".'

নয়রাট বললেন, অর্থাৎ, "করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।" এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপারে।'

'তাই ট্যানিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পেঁছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যানিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পেঁচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'না, পেটার, ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা ; তার আর কি করা যায়। তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে'।

'হয়েছে কি, টুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দু'পয়সা রেখে মারা গিয়েছে। টুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে টুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেলুকে বললে, "ভাই, তুই চ।" শেলু ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম,—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিন-মুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড় দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প্ কট্ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

'মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—'

আমি বললুম, 'আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্ৎসিস্কা শুধালেন, 'ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ।' তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়েবললেন, 'কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্ বিগড়ে গিয়েছে।'

'দুইজনাই একসঙ্গে বললে, "হে মা-মেরি এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না মা?"'

আমি বললুম, 'আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলেছিল,—

"এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে।"

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কি?,

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের "গোপালভাঁড়-সাইক্ল" শোনাব, তবে তার অনেকগুলি ফ্রান্ৎসিস্কার সামনে বলা চলবে না।'

নয়রাট বললেন, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্ৎসিস্কা ভাঁড়ারঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, তখন ট্যুনিস শেল্‌কে বলেল, "ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?"

'শেল্ বললে, "একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।"

'ট্যুনিস বললে, "যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন," বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।'

নয়রাট বললেন, সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্ট্ করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।

তা সে কথা থাক।

'ট্যুনিস আর শেল্ এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক-একখানা জান্—তর্-র-র্ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্-মেহন্নত, বিন্-কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

'তখন ট্যুনিস বললে, "ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোন গল্প মনে পড়ছে না।"

'তখন শেল্ বললে, "ঘাবড়াস নি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।"

'বলে তখন শেল্ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

'করে করে তারা আরো চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

'মাত্র একতলা বাকি। শেল্ দুম্ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর উনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, "ভাই আমার গুদোমও খতম।"

তখন ট্যুনিশ বললে, "কুছ্ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।—আমরা ফ্ল্যাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।"

* * *

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডুলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন ?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, "সে কি কথা ? এখনই যাবেন কেন ?' কিংবা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি ?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজ-কর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলণ্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্‌-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলণ্ডে জন্মালে হত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট (ইংরিজিতে tut tut), ও রকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন ?'

আমি বললুম, 'তাহলে আসছে জন্মে, পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলণ্ডে আর মাদাম ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা (ব'লে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কি ? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কর্পূর হয়ে যাব, 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কি ?

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন ? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন ? সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যদি ইংলিশ্ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।'

লাইন কোন্ দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রতি-ভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনো মানে হয় না, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন ? ইংলণ্ডের মতো বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে

ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শেল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্‌খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,

'প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—
—আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।'

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

* * *

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি ?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর—বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা ভদ্রতা "আরম্ভ" করলেন !'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত- -ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর—আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলট গুঁজে দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

'প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, তারপর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারে নি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই 'সহধর্মিণী' পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন ?'

বললেন, 'এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।'

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, "এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।

'আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের দু কোণে গভীর প্রশান্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূর্খটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরেক আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে 'ব্যা—ড' বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো থাকতি হল না কিন্তু সেও রুটিনমাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা! ফার্সীতে প্রবাদ আছে,—

"দুশ্‌মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত।"

"দুশ্‌মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান্ হয়!"

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রানৎসিস্‌কাকে বললেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফার্সীতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম—অপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।

'তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে, বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক্ লেমনেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বললে, "ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

'গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বললে—"তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট'।"

'বলে কি? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডল্‌ফ্ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, "তুই উপরে চ, কেক খাবি।"

'বললে, "না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে।"

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোথেকে সাহস পেলুম আজো জানি নে। বোধ হয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাংক উই। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখ্খুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা	এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা	খুশীর গীত গাইতে যা।
ইয়েহ্ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী	দেশের তরে জীবন ধন
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা॥	দেশের লাগি করবি নে পণ?
তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়্	শেরে হিন্দ এগিয়ে যা।
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর্	সামনে মরণ ফিরে না চা॥
আসমান তক্ উঠায়ে সির্	আকাশ বিঁধে তুলবি শির
জোশে ওতন্ বঢ়ায়ে জা॥	দেশের জোশ বাড়বে বীর।
তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে	বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তেরী সুন্তা রহে	খুদা তোরে দেবেন জোর।
জো সামনে তেরে চঢ়ে	সামনে বাধা পরোয়া না কর
(তো) খাক্মে মিলায়ে জায়॥	ধুলায় তারা পাবে যে গোর॥
চলো দিল্লী পুকারকে	হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান সম্ভাল্কে	কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লাল কিল্লে গাঢ়কে	লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা॥	এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা॥	এগিয়ে যা, এগিয়ে যা॥

শেরে হিন্দ্=হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র, জোশ্=শক্তি, কৌমী নিশান=জাতীয় পতাকা

দ্বন্দ্বমধুর

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে,
তার অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন উভয় বাংলার
যে-সব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা বাংলাকে
সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে
সত্যবন্ধ—তাঁদের উদ্দেশে

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পেঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবুলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা তাঁর 'স্বামী বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল। সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো ?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখি নি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথা ? বস—না, তার ফুরসত নেই ?' ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী ? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায় ? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে ? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল ?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোনখানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছে ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'কী হল তার ? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে বেশ আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায় ? খাল বিল নদীর খোলা

হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখ্খনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, "এমখ" হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহরে পৌঁছলাম—'

আমি শুধালাম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজ বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশী কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।'

'আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি।

জাহাজে খালাসীদের কপালে ও জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।'

'তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট খাল।'

বুঝলুম, 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্স'ই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খপরটি রাখে।

'পুর্স'ই থেকে মার্স'ই, মার্স'ই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকে নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরকিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।'

'নুউক পেঁৗছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।'

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।'

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার স্যুট, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিসের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার স্যুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিস দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।'

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ-খোঁজ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয় সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন পুলিসের গোসাঁই ?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসৎ হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বুড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন !'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে ?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম

ডিসপ্যাচারের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী। বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপনার ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।'

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, "তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিঁকল না?'

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।'

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?'

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তা সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে-অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিঁধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।'

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।'

'প্রথম পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার

জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে দু শিফ্‌ট্ আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুলুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।'

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না-হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছিতে হয়।'

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানক্ষেতের মাঝখানে।'

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।'

'কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।'

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কী কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের

ঠেকনার খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে ? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।'

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে ? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন ?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর ?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কী করলে ? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায় ?"'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে ?'

'সমীরুদ্দী মিরাকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পেঁছিল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায় ?

নোনামিঠা

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকাবাদ পেশওয়ার দূরে থাক্, যাঁরা, পাটনা-গয়ার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরি লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেন-ই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আলস্টারটার দরকার হবে না তো !'

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম ; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে, ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম-পুখতের' রান্না বা 'পুটপক' করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি-টীম' হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভূত বলেই মনে হল।

ডেক-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোন সিলেটী ছিল না। এ-রকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশ-কুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনও খরচা নেই; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এস্থলেও সে-আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা। রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকী দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজনা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এ ফরাসী যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয় এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটীতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন্ গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ায় তাবৎ দরিয়ার মাছের মত কিলবিল করে এ-সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটী শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটী ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়; ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যেভাবে একই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন ওই কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের

সামনে ধরলুম। দুজনেই সকসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে এবং আমার বাপ-ঠাকুর্দার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানি, আজ তারা আমার দর্শন পেল. আমার সামনে ওসব—তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকী এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়িঘর ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ওই তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরোন লোক। পাঁউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা।। পান্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তাভাত। মুলে নেই ঘর, পুব দিয়া তিন দোর। হুঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হোক তোমাদের ডাল ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরে নি!'

বললে, ঠিকই শুনেছেন সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কী, কোনও কোনও বন্দরে চাল এখন মাগ্গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে বলে। সারেঙ দেশের জাতভাই কি না, না হলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কী করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ কর নি?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি "ফ্রিঞ্চি" না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজী হলেও না হয় আমাদের মুরুব্বীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্যি জাহাজ; ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়। সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম, 'বাস বাস।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস, ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইন্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরিতে একটা ঢুঁ মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক, আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানাটেবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা সু-লিয়োৎনা—অর্থাৎ সাব অলর্টান। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলো নিবেদন করলুম।

শুনে সে তো মহা উত্তেজিত। আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলায় ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইনুই—অন-হার্ড-অব—, ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!'

আমি বললুম, 'রোস রোস। এত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, যো গার্সো (বাছা)! ওসব কথা থাক, দুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিকে বললে হাতাহাতি বোতল-ফাটাফাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এস্থলে তো দোষী তোমরাই জাতভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ওই-যু-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুরবেলা ঘুমোয় না। তবু কেন বাঙালীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী, এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আপন আপন ডেকচেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনত মস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন। শুকনো মুখে ঢোক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সবপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কী প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন

এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিনশো তিরানব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তা-ই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে-খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্তকণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসীতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এরকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো সারেঙটা!

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পর চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস কারি খেয়েই আপনারা আ-হা হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চিরা যখন কোর্মা কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—না, থাক, আপনার আমার বাড়িতে মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে-রাত্রের খালাসীদের তৈরী গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ত বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর ইটা পরগনার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবত! মনু গাঙের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারল আমি কত বড় বিদ্যেসাগর। যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহাপাষণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সেলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ী মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো কানা করে ফেলেছে; কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক রেঙখেকী, এমন তাড়া লাগালে যে আমরা পাঁচজন মদ্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাই নে। তবে শুনেছি, মেয়ে-মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করত। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাঙচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে-কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছ?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটী টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে "না" বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে-কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'বাস্ বাস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর "না" বলবেন না। আমি বুড়ীর হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি 'হাঁ হাঁ, কর কী, কর কী' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয়, ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন্ মূর্খ বেরয় দেশভ্রমণে! কত না বাহান্ন রকমের যত সব বিদ্‌কুটে, খুদার খামকা গেরো!

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন

নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাব তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার। এই কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকী সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যে-রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর' 'হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ-চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল।' 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, 'মেরি হ্যাড এ লিট্‌ল ল্যাম্'-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরি ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম, 'আমি কি মাদাম মা-ও মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন্ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন, 'আঁত্রে (প্রবেশ করুন), মঁসিয়ো।'

ভরসা পেয়ে বললুম, 'মঁসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য!'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী সুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নকশার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতে বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কী করে সে-কথা ইচ্ছে করেই তুললুম না।

ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত-শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরও কত কী।

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা! আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূর্ব লাবণ্য! কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ নয়? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েল পেন্টিঙে আমি এ রকম দেবশিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনিফিনিট অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, 'লঁ্যাদ, সে ত্যঁ প্যাই ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা?'—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনটাসটিকে দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজী হয় না—অঁক্‌ল্‌ (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ওই ধরনের আরও কত কী!

আমি আবার প্রমাদ গুনলুম। কথাটা যে-দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মঁসিয়ের রুচি কিসে—চা, কফি, শোকোলো (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটীতেই বললুম, 'থাক্‌ থাক্‌।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরুব্বীদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কী দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম, 'বস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কী সওগাত চায় তখন চাইলে ইণ্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির দেশের দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাই নে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara ইংরিজিতে (Sarah), ছেলেটির নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোঁকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে-সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছি নে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম্ দেখেন নি।' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম্ এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'এই তো বাজান (বাবা+জান, সিলেটীতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁক্ল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বলেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে, 'পার্দোঁ' অর্থাৎ বে-আদবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জনি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিসুদ্ধ আমাকে ট্রাম-টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কণ্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মঁসিয়ো এ (ত্) এত্রাজেঁর, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস্ ফিস্ করে) ফরাসী বলতে

পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দি ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার।'

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে ওপরে ঘুমুতে যাব-যাচ্ছি, যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্ফর্টার।

ইয়োরোপের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিস কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে। ভাববে আপনি খেপে গেছেন। এ-তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউপাশায় 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না; চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্বোস্—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কী আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে! তা হলে, দয়া করে আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম, 'আমি কি এ ঘরে 'মাগনা'' বসেছি, না, এদের জমিদারির প্রজা। কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চল উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কী? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনও আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বলল, 'না হুজুর। খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে সে রাত্রে খেতে বলতে পারে নি তার জন্য দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে, আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে নি। আসবার সময় বললে, "উনি যা বলেন তাই হবে"।'

আমি শুধালুম, 'বউ না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতাম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাই নে বলে না-বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভাল লাগল।

আমি শুধালুম,'আমি তোমাদের বাড়িতে বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কী করে? আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়। আমাকে লাগাল না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমার মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর কানে পেঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'

'আর মানুষকে কি কখনও ভ্যাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনখানেই না।'

-'আপনি তা হলে সব কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।'

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানি নে, হুজুর, হঠাৎ পুলিস লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাই নে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নীচে শুয়ে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর ক'দিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারি নি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম ডাক্তাররা কী সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউ কখনও ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখে নি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু-দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কখানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারল না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যেরকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিত আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, ভয় নেই, সেরে উঠবে।

'তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে—"ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।"

'ক বছর? কে জানে? এক হতে পারে, চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানি নে।'

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিস। খানা-পিনার কথা তুলব না হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?'

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগাল। হাসপাতালে দু মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আমেজ করতে পারলাম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কী মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না কেন? বুঝলাম রাশিতে জেল আছেই। মনে মনে বললাম, কী আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলাম।

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কী একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রা'টি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলাম, পাড়ার লোক ওকে মানে।

'আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কী খেয়েছি জানি নে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাই নি। তাই "বরান্দি"টা বাদ দিল।'

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে? ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা—এ সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে!'

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কী নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম ওটা ফরাসী Suzzanne, এবং আরও বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশে মরমিয়া ভাটিয়ালী রচেছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শ-

কাতরতা এবং কল্পনাশক্তি ওদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তার পর কী বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত— হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখাতাম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিই নি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কিছু গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানি না হুজুর, কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানত যে ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।'

'কিন্তু হুজুর আমার বড় শরম বোধ হত; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ। কিন্তু করিই বা কী?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমায়-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেলে এক মস্ত বড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কী করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কী কী নকশার কাপড় বেরয়। তারই ভিতর একটা দেখতে পেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

'আমার বাপ ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।

'অনেক ইতি উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁতের দাম কত?" বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারি খুশী হল, কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাই নি। বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা কিনবে কে? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্ফর্টার। দিশী নকশায়। প্রথম নকশায় আধখানা ফুটতে না ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবী এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই-পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু পয়সা আসতে লাগল। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাব, সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নকশা নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নকশাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার

হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ীর কথা পাড়ছি নে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না, দু পয়সা হতে সুজন বললে, "তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?" আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমাঁর মা-ই বললে, ব্যাংক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

'মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও একশো। ঢেউ-পাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে-পরতে তো পারছেই।

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।

'আমার মাথার বাজ পড়ল, সায়েব; যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুলিসের সঙ্গেও আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ফাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি, তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশী নাড়া চাড়া না করি। প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এ দেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কী বলেন, হুজুর?'

ডাহা মিথ্যে বলি কী প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্ সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারীর বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাওচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তাখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, "তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।" এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, "এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।" আমি বললাম, "সুজন, তুই

জানিস নে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে "পাতী" (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরিবের সঙ্গে কথা কয় না।" আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'। ওইটুকুই বাকী ছিল।

'সুজনই আজ বললে, "ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।" এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন, আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ কর।'

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষ রাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল, আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা !'

মণি

'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে ঊর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ-নায়িকাকে সমান সম্মান, সমান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো ঊর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাঁদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেন নি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতৎসত্ত্বেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেন নি, নির্ভেজাল রূপকথাতে যে-রকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায়। হলই বা। তাই বলে কি শেষমেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না ?

জানি নে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কী উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্রবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকূল-কাঁচুলি কেচে দিত তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? ঊর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কী উত্তর দিতেন ?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত,

বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তর চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলায় সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দুজনকে পথমধ্যে গুমখুন করলেন কেন, তা হলে তিনি কী উত্তর দিতেন ?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শুকুরুল্লা এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচে গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারি নি। মাধাই আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বচ্ছর ফেল মারত, আমি ফার্স্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, আমি মোক্ষম মনঃস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎ চরিত্রই জীবন্মৃত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি কাবুলে ছিলাম, তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয় নি। 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদি করেন নি। পেশাওয়ারের পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টর আহমদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র পরিক্রমা করেও দেখতে পাই নি। আমার বিশ্বাস পাঠান-প্রকৃতি ধরে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইপাইয়ের ফকীর, ইংরেজীতে বলে ফকির অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যাণ্ড জাইণ্টস, নো নর্মেলস্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃণা' নয়—ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চাণক্য বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে-চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ ! বোধ হয়

প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহুদূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বান্ধব, দুনিয়াদারি-বাবদে-বেকুব বাঙালী। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিয়েই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিই নি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসি নি। আমি লিখতে বসেছি তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উল্লিসিত পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহৃদয় সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরানী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব আলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই ঃ

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই—কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শবশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামীগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তার অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমারই বা এসব বলার কী দরকার? আমারই বা জেনে কী হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেন নি?'

আবদুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেন নি সে-কথা আমি কী করে জানব? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলাম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাত্রে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভালো লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে

না। এ-কথা বলে রাখা ভাল।

*　*　*　*

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো যেত। তিনি দফতরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম আর বাবুর্চিকে সবিস্তর বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু ফার্সী পাঞ্জাবী পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান', আর সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি, সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যান্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবনু, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশিন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গাট্টাগোট্টা গাল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে কেলে গফুর মহম্মদ খান। দেখি,—হকচকিয়ে গেলুম,—দেখি, দীর্ঘ এবং তম্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে-লম্বা শিলওয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত নেবে-আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার অর্ধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ-মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশিন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে। আমি তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তম্বঙ্গীর ক্ষীণ দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি; বরঞ্চ বলব, তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনের-ষোল হয় কি না-হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের

আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান ?

তা সে যাক গে। তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম !

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-ণি—'

মণি দোরের আড়লে দাঁড়ালে দুজনাতে পশতু ভাষায় কাথাবার্তা হল। আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনও বাবুর্চিই করে কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না। মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করছে। ভালই হল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটাও তৈরি করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই। সেঁকো বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকাল। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতাম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রেই হুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির-মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম, 'পশতু', তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম কায়দায় পদ্মফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, 'ডডনং'। অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরী লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুঁদে ও মুদ্রা দেখিয়েই শঙ্করদর্শনের আলোচনা চালাত, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে

মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায়, আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কতল করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা বলে সে শুধালে, 'মণিকে আপনার কী রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার যে-ভাবের আদান-প্রদান রস-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদান' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা অতখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা না-লাগার কী আছে?'

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, 'এ আপনি কী বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পখতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালবাসেন। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয় নি। 'শাদির পয়লা রাতে বেরাল মারবে', এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম!

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশওয়ার-কোহট, বন্নু দেরা-ইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাসী-দফতরী, কেরানী খাজাঞ্চী মণিকে শাদি করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কীরকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল। লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেই বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম 'থাক্ থাক্।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলুম; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে

ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করল।

মহবুব আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকা ঘোড়ার ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবদুর রহমান বলছিল, এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দর্জির দোকানে ভিড় লেগেছে। কী করি, বলুন তো?'

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলী চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেল, সে নাকি—'

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'বাস্‌, বাস্‌।'

মহবুব আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ-বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে শাদি করেন না। যদিও-কুরান হদিসের রায়, যে-কোনও মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেবেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কী করে জানবে বলুন? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কী করে বুঝবে বলুন?'

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক স্টর্ম-ইন-এ টি-পট! তিলকে তাল! আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায়, তাতে আরার কী?'

মহবুব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কী?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণ এল। বললুম, 'না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনও সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশেই বা দিই কী প্রকারে?'

* * *

কাবুলে এপিডেমিক সর্দিকাসি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার। ভেবেছিলুম

কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হল।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়ি বাজি, বিডন্-বিশপ ফল্স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছে নাকি?' মণি এক বর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির বেশ উত্তেজনা থেকে অবশ্য আন্দেজ করেছিলুম, আরও কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কী বলব! সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না, তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে, "বাদশা আমানউল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এদেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক। তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু'শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সাহেব আর কি করেন! শাহানবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এদিক আসার ফুরসৎ তাঁর আর কই?'

আমি জীবনে ওই একবারই গীতাবর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাবৎ!

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল, এই ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমিও শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?'

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে-ইস্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবারে মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। ন্যাকরা-গলা আবদেরে-আবদেরে সুরে বললেন, 'তা হলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসুরত

বলে মনে করেন ?'

আমি তো রেগে টঙ। চিৎকার করে বললুম, 'বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন। আমার কী আপত্তি ? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখা মাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন ? চিৎকার করে তখন কী বলেছে, শুনেছেন ? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে, ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেন নি।'

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, 'মেহদীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিয়ে হয় না ?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কতবার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে, ও বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান-জগতে। বিশ্বভুবনের খবর ও রাখে না।'

আমি শাধালুম, 'আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম. এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কী প্রকারে ? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরও বেশী প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক কান বুজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারি নি ; তাই তার একটা সমাধান খুঁজেছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

আমি আর কী বলব ! অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

* * *

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যান্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষন্ন। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইলুম, 'ভালই হল', কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, 'আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পৌঁছত, কেউ বলত কাবুলে লুঠতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাসী থেকে ও-চাপরাসীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

'তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হল।'

আমি কিছু বলি নি।

*　　　*　　　*

একদিন কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে গুডজর্নি' বাঁভইয়াজ জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন—এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।'

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারি নে।'

তিনি কথা কটি উর্দু হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

অ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কী চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই, গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুরবাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, দুই বৃদ্ধ মুরুব্বী স্থানীয় লোক বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকেরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি।' এঁরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তাহলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, 'সলামত?' কথাটা ফার্সী! হয়তো পশতুতেও চলে! অর্থ 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম,

'এটা মহব্বে আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, 'পশতু তা হলে শিখেছেন ?'

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলুম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটি কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনেব দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজরে গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সে রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

চাচা-কাহিনী

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোসাঁই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা—গোসাঁই. মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না, আজ বললেন, 'অত ডরাচ্ছিস কেন ?'

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, 'ওটা খাবার কী প্রয়োজন ? আপনি তো কখনও খান নি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার ?'

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুরদা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায় এ দেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচী মাতাল নয়। আর আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে ?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা ?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ। আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?'

ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী,
রূপসিনী বর্ণন্দিনী
নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদুখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোসাঁই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদুখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা। শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, "ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ? রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু 'ভদ্রস্থ' করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ-মার্কা করব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পার; কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?"

ব্রাখেল বললে, "না হয় একটু বাঁদর-নাচই দেখালে।"

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললে, 'অজ পাড়াগাঁ ইস্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে

ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য দ্যাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপর ব্রেস্‌ট্‌-কোট পরা নয়, টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, "বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আজ্ঞা হোক।"

বুঝলুম, ফন্‌ ব্রাখেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং স্যুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিণ্ডেনবুর্গি গোঁফ, এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুশ্ৰিজ রায়ের চোখের মত লাল, জবাকুসুমসঙ্কাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল; দাড়ি-গোঁপের ছাঁকনি দিয়ে যা বেরোল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ" বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত করলুম, এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে গিয়ে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হান্টারওয়ালী ফিয়ারলেস নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্‌ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাসল্‌। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, "ওই আকাশে চড়তে হবে?"

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, "ইয়াঃ মাইন হের!" দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পেঁৗছে যাব স্যার্‌।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বী চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টায় ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক্‌, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে

যেখানে দাঁড়ালো তার ওপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, ভিলিকিনি মানে ?'

চাচা বললেন, 'ও ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন্ ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও ; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।'

তারপর আমাকে বললে, "ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু সুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কী ? ডিনার-জ্যাকেট পর নি ?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।"

ফন্ ব্রাখেল বললে, "উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, "তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ডভর্তি ডিনার-জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম ; এই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।"

আমি বললুম, "তওবা, তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পৌঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত টেল করবে।"

বললে, "না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে ! তুমি চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নাও, আমি চললুম।"

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভর্তি শার্ট, কলার, বো হীরে-বসানো স্লীভ-লিন্‌ক্‌স, আরও কত কী !

'মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত।

'তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশী হয়ে বললে, 'হেঁ-হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু ওই পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক গে, ঈভনিং-ড্রেসে কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিস দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার্, আপনাকে তো কখনও শিস দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস দিতে পারেন ?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যাণ্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিস দিতে যাব কেন ? শিস কি দিয়েছিলুম আমি, শিস দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা যাক।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্‌লের ব্যানকুয়েট-হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে। তার আর বিচিত্র কী এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাতওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজী আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল্ দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল্ কোন্ শতাব্দীর জানি নে কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্য প্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইণ্ডার (ভারতীয়) দেখেছেন, কালো ঈভনিং-ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাঁইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে

তাকালে ঠিক বুঝতেই পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয় নি। কই, আমি তো একদম রেডিমেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হাল-ফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রি ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাস করা চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল ?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, "পাপা, এই হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ার আফে !"

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যান্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, "পফুই—ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই।"

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, "আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।"

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন "ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।"

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হালকা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দু দিকে সারি বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোন্‌টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ ?

আসল খাবার পূর্বের চাট—'অর দ্য অভ্রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধাল, শেরি ? পোর্ট ? ভেরমুট ? কিংবা হুইস্কি সোডা ?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "নো বিয়ার !"

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা !

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁটে

ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।'

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ইভনিং-ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট-হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপি বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস!'

গোসাঁই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা!'

চাচা বললেন, 'অপরাধ নিস নি গোসাঁই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ'কারু ব'-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক্।'

তখনও খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার দু মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় হের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, "বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?"

বুঝলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ হুঁ করে গেলেই চলে কিন্তু আমি বললুম, "পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ-হৈ করে ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে।"

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্টাটস্‌বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরুচ্ছিল, ইঁদুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, "ওই ড্যাম ক্যাটটা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।"

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন রোস্ট টার্কীতে পৌঁছেছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরস্ত ইভনিং-ড্রেস-পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, "জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইণ্ডার।" বড় নার্ভাস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—" তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি শুধু রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।"

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে

সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনও বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, "গুস্টাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এস।"

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারও মুখে এতটুকু চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পোঁছে বললুম, "নো লিকার, বিয়ার প্লীজ!"

বাবা হেসে বললেন, "আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?"

বললুম, "আলবত!" অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র দু'দিন, কলকাতার ওয়াই. এম. সি. এ-তে। এখানকার বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশী শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড বাই, তোমরা খেলোগে।"

ক্লারাও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে "গুড নাইট" বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নীচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, "নো শ্যাম্পেন।" আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, "এ আবার কী কিউ দিলে?"

মার্কারের মুখে কোন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশী হয়েই আলমারি খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ীর মত সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, "এইটেই তো, বাবা, বেশ; তবে ওই পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?"

আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবিশ্যি আমি করি নি; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লীড পায় না।

রাত ক'টা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

হের ফন্ ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, "তোমার লাক বড় ভাল।"

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, "লাক, না কচুর ডিম! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক্ দ্যাট্!"

রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমিও অষ্টমে উঠে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরও চটে গিয়ে হুংকার দিলুম, 'তোমার মুলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না।' অথচ বেচারী বুড়ো থুথুড়ো, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার-চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও পরিপাটি ঈভনিং-ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, "সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।" তারপর ক্লারার বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্‌ফ্‌গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "হুঁ হুঁ হুঁ।"

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস্‌ পনেরো মার্ক ভল্‌ফ্‌গাঙ্‌ দুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়. এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম, এবার গেল আরও কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেন্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলছে পাইকারী হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক

বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বললেন, "হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—"

আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গুড্ ড্যাম্ লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, "তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যান্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম—"

বাপ-জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটুকাটব্য।

এমন সময় দেখি, ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোটলোক', 'মীন', এইসব আশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, "অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।"

বেরুবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, "সরি, সরি, প্লীজ প্লীজ। আমাদের দোষ হয়েছে।"

তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনও শুনি নি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে! ঈভনিং-কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি! ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

আর এদেশে সবাই ভাবে ইণ্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

তা হলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে সুটকেসটি ওইখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইল-খানেক এসে ফিরে তাকালুম ; নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি।

চোরের মত গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা ?'

চাচা বললেন, 'আরে শোনই না শেষ অবধি।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যান্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মর-মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন ? ও তো মাতলামো না, পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

'তুমি যখন দাদার সুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তার পর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না ; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, "লেখাপড়ার সময় কোথায় ? আমি তো করি হৈ-হৈ"—আমি জানতুম একদম বাজে কথা ; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না।'

'শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ।'

'তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই ; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।'

'কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না ; বাবা-জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছু মাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস দিয়েছিল সুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছপালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্‌প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সূর্যিঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই. তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সূর্যি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর-নরৌ-নরাঃ, গজ-গজৌ-গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি, নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁজে, তারপর অন্ধকার রাতে, পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্কর খেয়ে

পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে-কথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক, ফ্রেস্কো, স্টুক্কো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, মেদজো-টিন্ট্ আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো লেখা-পড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউণ্ডুলে না বলে বলবে শিল্পী, কলাবৎ, আর্তিস্ৎ।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোদ্দপুরুষ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক্, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-ওলার ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুদ্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠল পরিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করছে কে; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ?'

কার হাতে আর দেবেন ? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশী বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রম-দেবতার আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা কোর।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল-গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা 'এনকোর', 'সাধু সাধু' রব কাড়লে।

সুদূর দিক্প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মেরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা

ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ দুম্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদ বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গাঁয়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধ-ঘণ্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনও পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নামে যাক গে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম! একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত তীক্ষ্ম কেমন যেন এক আর্তরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফী-ী-ী-ী-ীৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—ফীঁৎ ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না প্রেত, না ডাইনী!

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস—কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম, আমার সঙ্গে কদম কদম বাড়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের "কঙ্কাল" গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান; তিনি ভয় পান নি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি, যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা

ফুটে উঠছে। কিন্তু হলদে রঙের। 'প্যোর কোলমনস মাস্টার্ড'।'

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগল পুবের বাতাস। তাই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিংবা রেল লাইনে পেঁছিবই পেঁছিব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন!

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকি ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু 'ওয়া গুরুজীকী ফতে' বেরিয়েছিল—'ওবা গরজীকী ফত' হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিঁৎ ফিঁৎ করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিঁৎ ফিঁৎও জোরে বেজেছে। আস্তে চললে আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিঁৎ করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি কলাবৎ হবার চেষ্টা করি নি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

তখন আমার কথা ভাবেন নি।